স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটি

কাসেম বিন আবুবাকার

(১) "যেই ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখিবে, আমি তাহাকে ইহজগতে যতটুক ইচ্ছা, যাহাকে ইচ্ছা, সত্বরই প্রদান করিব, অতঃপর তাহার জন্য দোযখ নির্ধারন করিব, সে উহাতে দুর্দশাগ্রস্ত (ও) বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করিবে।

আল কুরআন ঃ সূরা-বণী ইসরাঈল, পারা-১৫

(২) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, " তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম।"

বর্ণনায় ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)–বুখারী, মুসলিম

(৩) "যে কেউ ধন-সম্পদকে সম্মান করেছে, আল্লাহ পাক তাকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছেন।"

–হাসান বসরী (রঃ)

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

হৃদয়ে আঁকা ছবি
প্রেম ও স্বপ্ন
তোমার প্রত্যাশায়
ভাঙ্গাগড়া
কে ডাকে তোমায়
মেঘলা আকাশ

ট্রেন যখন নীলফামারী স্টেশনে পৌঁছাল তখন বিকেল পাঁচটা। ফায়সাল ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এসে একজনকে জিজ্ঞেস করল, মসজিদ কোন দিকে বলতে পারেন?

ঐ তো দেখা যাচ্ছে, বলে হাত তুলে দেখিয়ে লোকটা চলে গেল। সাড়ে পাঁচটায় জামাতের সঙ্গে আসরের নামায পড়ে ফায়সাল মসজিদের বাইরে একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে বলল, আমি খোকসাবাড়ি যাব, কিভাবে যাব একটু বলে দেবেন?

বৃদ্ধ লোকটির বয়স প্রায় সত্তর বছর, চুলদাড়ি সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। তবে জরা এখনও ওনার ধারে কাছে আসে নি। একহারা চেহারা হলেও সুঠাম দেহের অধিকারী। ফায়সালের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ঢাকা থেকে।

কার বাড়িতে যাবেন?

ইনসান চৌধুরীর বাড়ি।

উনি আপনার আত্মীয়?

বৃদ্ধকে একের পর এক প্রশ্ন করতে শুনে ফায়সাল ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠলেও তা প্রকাশ না করে বলল, না, উনি আত্মীয় না। এবার কিভাবে যাব বলুন।

বৃদ্ধ তার কথায় কর্ণপাত না করে জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে ওনার বাড়িতে যাচ্ছেন কেন?

ফায়সাল আরো বেশি বিরক্ত হয়ে বলল, এসব জেনে কি লাভ আপনার?

লাভ আমার নেই, তবে আপনার আছে?

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনাকে বলতে হবে না, অন্যের কাছ থেকে জেনে নেব বলে ফায়সাল হাঁটতে শুরু করল।

এই যে দাদু, রাগ করে চলে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান। তারপর নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, আপনাকে দেখে আমার নাতির কথা মনে পড়ল। তাই ঐ সব জিজ্ঞেস করে আপনাকে দেখছিলাম।

বৃদ্ধের কথা শুনে ফায়সাল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জিজ্ঞেস করল, আপনার নাতি এখন কোথায়?

নেই। আল্লাহ তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। তারপর বললেন, খোকসাবাড়ি এখান থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল। রিকশায় গেলে ত্রিশ চল্লিশ টাকা ভাড়া নেবে। হেঁটে গেলে ঘন্টা দেড়েক সময় লাগবে। ওখানে কেন যাচ্ছেন বললেন না তো, তবে যে কারণেই যান না কেন, খুব সাবধানে থাকবেন।

ফায়সাল অবাক হয়ে বলল, কেন বলুন তো?

ইনসান চৌধুরী মানুষ না, হাইওয়ান ছিলেন। ওনার নাম হাইওয়ান চৌধুরী হওয়া উচিত ছিল? এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই, যা উনি করেন নাই। আপনি না বললেও বুঝতে পারছি, চৌধুরীর স্টেটে চাকরি করার জন্য এসেছেন। এর আগেও কয়েকজন এসেছেন, তাদের মধ্যে শুধু একজনই প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছেন, বাকিরা পারেন নি। আপনি দেখতে অনেকটা আমার নাতির মতো, তাই এত কিছু বলে সাবধান করলাম। আর আমার কথা যদি শোনেন, তা হলে বলব, ঢাকার ছেলে ঢাকায় ফিরে যান।

কিন্তু ইনসান চৌধুরী তো অনেক বছর আগে মারা গেছেন? ওনার একমাত্র মেয়ে সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য একজন ম্যানেজার চেয়ে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন।

হ্যাঁ, উনি অনেক বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু ওনার মেয়েও বাবার মতো। ইনসান চৌধুরী মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরজামাই করে রেখেছিলেন। জামাই খুব ভালো ছেলে ছিল। শ্বশুরের জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করত বলে ইনসান চৌধুরী জামাই-এর উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। ওনার মেয়েও স্বামীর প্রতি তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই বাবা মারা যাওয়ার পর স্বামীকে ওনার প্রেমিকের দ্বারা মেরে ফেলেন। তারপর থেকে মেয়ে বাবার সবকিছু দেখাশোনা করছেন। যে মেয়ে স্বামীকে মেরে ফেলতে পারে, সে মেয়ে কেমন হতে পারে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?

ফায়সাল বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, হাদিসে পড়েছি শোনা কথা বিশ্বাস করতে নেই। অনুসন্ধান করে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে হয়।

হাদিসটা আমিও জানি। ঠিক আছে যান। আর দেরি করাব না।

ফায়সাল সালাম বিনিময় করে ভাড়া ঠিক করে একটা রিকশায় উঠে বসল।

খোকসাবাড়ি গ্রামে ঢুকে রাস্তার পাশে একটা মসজিদে মাগরিবের আযান হচ্ছে শুনে ফায়সাল রিকশাওয়ালাকে থামতে বলে বলল, আমি নামায পড়ব। সে জন্য আপনাকে পাঁচটাকা বেশি দেব। তারপর জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে চৌধুরী বাড়ি কত দূর?

রিকশাওয়ালা বলল, বেশ খানিকটা দূর। পাঁচ টাকা বেশি দিতে হবে না, আমিও নামায পড়ব।

নামায শেষে রিকশায় উঠে ফায়সাল বলল, আপনি নামায পড়েন জেনে খুব খুশি হয়েছি। কবে থেকে নামায পড়েন?

ছোটবেলায় আব্বা নামায ধরিয়েছেন তারপর আর ছাড়ি নি।

সুবহান আল্লাহ, আপনার আব্বা বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ বেঁচে আছেন, তবে খুব বুড়ো হয়ে গেছেন।

আপনারা কয় ভাই?

পাঁচ ভাই।

সবাই এক সংসারে আছেন?

না। আব্বা এক এক করে ছেলে বিয়ে দিয়ে ভিন্ন করে দিয়েছেন।

সব ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?

চার জনের হয়েছে। আমি সবার ছোট, আমার এখনও হয় নি।

আপনি তা হলে মা বাবার সংসারে আছেন?

হ্যাঁ, তবে সামনের বছর বিয়ে দিয়ে আব্বা ভিন্ন করে দেবেন।

আপনার তো বয়স হয়েছে, এখনও আপনার বাবা বিয়ে দেন নি কেন?

আমি এখনও দশ হাজার টাকা আব্বার কাছে জমা করতে পারি নি।

টাকার সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক? বিয়ে তো দেবেন আপনার বাবা।

তা তো দেবেন, কিন্তু দেন মোহরের টাকা আমাকে যে দিতে হবে। তাই সেই টাকা জোগাড় করছি।

অন্যান্য ভাইয়েরাও তাই করেছেন?

হ্যাঁ।

বাহ! খবু ভালো কথা তো? এরকম কথা কখনও না শুনলেও এটা ইসলামের কথা।

ততক্ষণে তারা চৌধুরী বাড়ির গেটে পৌঁছে গেল। রিকশাওয়ালা বলল, নামুন, এটাই চৌধুরী বাড়ি।

গেটের উপর একটা বাল্ব জ্বলছিল। তার আলোতে ফায়সাল দেখল, অনেক পুরানো বেশ বড় লোহার গেট। ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। তাই চারপাশে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না।

রিকশাওয়ালা অধৈর্য গলায় বলল, কই নামুন। আমাকে এতটা পথ ফিরে যেতে হবে।

ফায়সাল একটা ব্রিফকেসে কাপড় চোপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। সেটা নিয়ে রিকশা থেকে নেমে বলল, গেট তো বন্ধ।

রিকশাওয়ালা বলল, ভিতরে দারোয়ান আছে, ডাকলে খুলে দেবে।

রিকশা বিদায় করে ফায়সাল গেটের কাছে গিয়ে বলল, কে আছেন, গেট খুলুন।

দু'তিনবার বলার পর ভিতর থেকে আওয়াজ এল, কে?

আমি ঢাকা থেকে এসেছি, গেট খুলুন।

আপনাকে কি আসতে বলা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

নাম বলুন।

ফায়সাল আহম্মদ।

একটু অপেক্ষা করুন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর দারোয়ান গেট খুলে দিতে ফায়সাল ভিতরে ঢুকল।

দারোয়ান তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, আসুন আমার সঙ্গে। তারপর যেতে যেতে বলল, আপনার তো গতকাল আসার কথা ছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

গেট থেকে বাড়িটা বেশ দূরে। দোতলার বারান্দার কার্নিশে আড়াইশ পাওয়ারের বাল্বের আলোতে ফায়সাল দেখতে পেল, দোতলা পাকা বাড়ি। বাড়ির সামনে অনেক খানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে বিভিন্ন তরি-তরকারির চাষ করা হয়েছে। পাঁচিলের গা ঘেঁষে সারি সারি অনেকগুলো কাঁচা ঘর।

দারোয়ান তাকে ড্রইংরুমে নিয়ে এসে বলল, আপনি বসুন, মালেকিন কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেন। কথা শেষ করে চলে গেল।

ফায়সাল একটা সোফায় বসে ব্রিফকেসটা পাশে রেখে চারপাশে চোখ বোলাল, মেঝেয় দামি কার্পেট বিছান, সোফাসেট ও অন্যান্য সব কিছু অত্যাধুনিক। তিন পাশে দেয়ালে বাংলাদেশের কয়েকজন মনীষীর বাঁধানো ছবি। আর ভিতরে যাওয়ার দরজার উপরের দেয়ালে ত্রিশ ও পয়ঁত্রিশ বছরের যুবক যুবতীর ওয়েল পেন্টিং। একটা চার পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়ে যুবতীর হাত ধরে রয়েছে। যুবতীর ফটোতে তার চোখ আটকে গেল। এই অপূর্ব সুন্দরীকে প্রায় মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখে। তাই তার মুখের ছবি আজও মনে গেঁথে আছে। ভালো করে দেখে তার মনে হল, ফটোর মেয়েটি স্বপ্নে দেখা মেয়েটির বড় বোন অথবা মা। তারপর চার পাঁচ বছরের মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে মনে হল, স্বপ্নে দেখা মেয়েটির ছোটবেলার ফটো। এমন সময় ঠক ঠক শব্দ শুনে সেদিকে তাকাতে দেখল, দেয়ালে টাঙ্গানো যুবতী মেয়েটা তার সামনের সোফায় বসে টেবিলে পেপার ওয়েট ঠুকে শব্দ করছে। তবে ফটোর মেয়েটির থেকে এই মেয়েটির বয়স বেশি। তবু খুব অবাক হয়ে সালাম জানাতে ভুলে একবার ফটোর মেয়েটার দিকে আর একবার সোফায় বসা মেয়েটির দিকে তাকাতে লাগল।

ইনসান চৌধুরী পৈত্রিক সূত্রে বিশাল সম্পত্তি পেয়েছেন। কয়েকটা জলমহল ছাড়াও কয়েকশ বিঘে ফসলী জমি, কয়েকটা বাগান ও প্রায় পনের বিশটা বড় বড় পুকুর ওনার দাদা জয়নুদ্দিন খরিদ করেছিলেন। কিংবদন্তী আছে, জয়নুদ্দিনের বাড়ি ছিল ডোমার। তিনি একজন দরিদ্র কৃষক ছিলেন। সব দিন ঘরে অন্ন জুটত না। অভাবের তাড়নায় এক গভীর রাতে একটা দীঘিতে জাল ফেলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সারা রাত জাল ফেলে একটা মাছও জালে পড়ে নি। ফজরের আযানের সময় হতাশ হয়ে শেষবারের মতো জাল ফেলে যখন টানতে শুরু করেন তখন এত ভারি মনে হতে লাগল, যেন জাল ছিঁড়ে যাবে। অনেক কষ্টে জাল তুলতে সক্ষম হন। দেখলেন, একটা পিতলের কলসি জালে উঠেছে। কলসিতে কি আছে দেখার সময় পেলেন না, আযান শুনে সকাল হয়ে গেছে জেনে কলসিটা জালে জড়িয়ে ঘরে নিয়ে এসে ঢাকনা খুলে সোনার মোহর দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলেন তার বৌ মাথায় পানি দিচ্ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসে কলসি দেখতে না পেয়ে বৌকে জিজ্ঞেস করলেন, পিতলের কলসি কোথায়?

সায়রা বানু বললেন, আস্তে কথা বল, বাতাসেরও কান আছে। কলসিতে সোনার মোহর দেখে ঘরের মেঝেয় পুঁতে রেখেছি। তখন তাদের একমাত্র সন্তান আবসার উদ্দিন তিন বছরের। গ্রামের লোকজন জেনে যাওয়ার ভয়ে স্ত্রী, ছেলে ও সব সোনার মোহর নিয়ে খোকসাবাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে এই সব সম্পত্তি করে চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন। আবসার উদ্দিন যখন কলেজে পড়েন তখন একদিন জয়নুদ্দিনের খোঁজ পাওয়া গেল না। তিন চার দিন পর লোকজন ওনার লাশ একটা জলমহলে ভাসতে দেখে তাদের বাড়িতে খবর দেয়।

ধনী হিসাবে জয়নুদ্দিনের নাম আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। থানার পুলিশদের সঙ্গে ওনার দহরম-মহরম ছিল। তারা লাশ ময়না তদন্ত করার জন্য নীলফামারী হাসপাতালে নিয়ে গেল। ময়নাতদন্তে জানা গেল, গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে।

এরকম একজন ধনী ও গণ্যমান্য লোককে কেউ গলাটিপে মারবে, গ্রামের লোক বিশ্বাস করতে পারল না। তাদের ধারণা জিনেদের সোনার মোহরের

কলসি নিয়ে জয়নুদ্দিন ডোমার থেকে পালিয়ে এসেছিলেন বলে তারা ওনাকে গলাটিপে মেরে জলমহলে ফেলে দিয়ে গেছে।

এই ঘটনার প্রায় বার বছর পর ওনার একমাত্র সন্তান আবসার উদ্দিনের লাশও ঐ একই জলমহলে পাওয়া যায়। বাবা ও ছেলে একইভাবে মারা যাওয়ার ঘটনায় লোকজন বলাবলি করতে লাগল, ঐ বংশের উপর জিনেদের আক্রোশ আছে। হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে।

আবসার উদ্দিন চৌধুরীর একমাত্র সন্তান ইনসান চৌধুরীর বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন একদিন ওনার লাশও ঐ একই জলমহলে পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তে ওই একই রিপোর্ট, "গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে।" তখন থেকে শুধু গ্রামের লোকজনই নয়। চৌধুরী বাড়ির সকলেরও ঐ ধারণা দৃঢ় হয়।

ইনসান চৌধুরীর স্ত্রী লুৎফা বেগম ঢাকার ধনী পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে। তিনি ভূত-পেত্নি বা জিন বিশ্বাস করেন না। এই বংশের উপর জিনদের আক্রোশ আছে, স্বামী, শ্বশুর ও দাদা শ্বশুরকে জিনেরা মেরে ফেলেছে তাও বিশ্বাস করেন না। ওনার বিশ্বাস, দাদা শ্বশুর অন্য জায়গা থেকে এসে এখানে এত সম্পত্তি করেছেন, চৌধুরী বংশের এত নাম ডাক, এখানকার অনেকে সহ্য করতে না পেরে একের পর এক এই ঘটনা ঘটিয়ে জিনেদের আক্রোশ বলে রটিয়েছে।

ইনসান চৌধুরী মারা যাওয়ার সময় ওনার মা হাফেজা বেগম বেঁচে ছিলেন। তিনি শাশুড়ির কাছে সোনার মোহর পাওয়ার কথা শুনেছিলেন। তাই স্বামী, শ্বশুর ও ছেলেকে যে জিনেরা মেরে ফেলেছে, সে কথা বিশ্বাস করেন। বৌ লুৎফা বেগম ওসব বিশ্বাস করে না জেনে একদিন তাকে বললেন, ভূত-পেত্নী আছে কি না জানি না। তবে জিন জাতি আছে একথা বিশ্বাস করি। কারণ কুরআনে জিন জাতির কথা উল্লেখ আছে। এমন কি জিন নামে একটা সূরাও আছে। তা ছাড়া জিনেদের সর্ম্পকে আমাদের নবী (দঃ)-এর হাদিসে বর্ণনাও আছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে জিন পৃথিবীতে আছে বিশ্বাস করতেই হবে। তারপর ওনার শ্বশুরের সোনার মোহর পাওয়ার কথা ও নিজের গ্রাম ছেড়ে কেন এখানে চলে আসেন বললেন।

শাশুড়ির কথা শুনে লুৎফা বেগম কিছুটা বিশ্বাস করতে পারলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন, জিনেদের আক্রোশ থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?

হাফিজা বেগম বললেন, এই কথা আমিও আমার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "কোনো পীর সাহেব বা বড় আলেমের কাছে ঘটনাটা বলে তদবির করলে হয়তো জিনেদের আক্রোশ থেকে রেহাই পাওয়া যেত। তিনি স্বামীকে কথাটা বলেও ছিলেন; কিন্তু সোনার মোহর পাওয়ার ঘটনা

জানা-জানি হয়ে যাবে বলে তদবির করতে রাজি হন নি। কথাটা ইনসানকেও বলেছিলাম, সেও একই কথা বলে তদবির করতে রাজি হয় নি।

লুৎফা বেগম বললেন, এই বংশের পুরুষের উপর জিনেদের আক্রোশ। এখনতো আর কোনো পুরুষ নেই, মনে হয় তারা এই বংশের মেয়েদের উপর কিছু করবে না।

হাফিজা খাতুন বললেন, কি করে সে কথা বলব? আমার তো খুব ভয় হয়, চৌধুরী বংশের একমাত্র প্রদীপ ফায়জুন্নেসাকে নিয়ে। ওর কিছু হলে চৌধুরী বংশের নাম নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে যাবে। তাই বলি কি, তুমি তোমার বাবাকে সবকিছু জানিয়ে কোনো পীর সাহেব বা কোনো আলেমের দ্বারা তদবির করাও।

স্বামী ও তার উর্ধ্বতন পুরুষরা যে কারণে জিনেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তদবির করেন নি, লুৎফা বেগমও সেই একই কারণে কিছু করেন নি।

ইনসান চৌধুরী মারা যাওয়ার কয়েক বছর আগে হারেস নামে একটা ছেলের সঙ্গে একমাত্র মেয়ে ফায়জুন্নেসার বিয়ে দেন। হারেস ঢাকার শিক্ষিত ও সুদর্শন ছেলে। সে প্রথমে চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজার ছিল। ইনসান চৌধুরী মেয়ের বিয়ের জন্য এমন পাত্রের খোঁজ করছিলেন, যে নাকি সব দিক থেকে চৌধুরী বংশের উপযুক্ত এবং ঘরজামাই থেকে চৌধুরী স্টেটের ভার নিতে পারবে। ম্যানেজার হারেসকে ওনার পছন্দ হলেও বংশের মর্যাদার কথা ভেবে মন থেকে সায় পান নি। তারপর যখন জানতে পারলেন, পাশের গ্রামের এক সাধারণ ঘরের ছেলের সঙ্গে মেয়ের মন দেয়া নেয়া হয়েছে তখন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে হারেসের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে তাদের একটা মেয়ে হয়। ইনসান চৌধুরী নাতনির নাম রাখেন জেবুন্নেসা। ডাক নাম স্বপ্না।

বিয়ের সময় ফায়জুন্নেসার কোনো প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। তবু মায়ের কাছে তার মন দেয়া নেয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু কাজ হয় নি। কথাটা জেনে লুৎফা বেগম মেয়ের সাথে রাগারাগি করেন। ফলে এক রকম বাধ্য হয়ে সে হারেসকে বিয়ে করে।

হারেস ইনসান চৌধুরীর মেয়ের মন দেয়া-নেয়ার কথা না জানলেও তার উগ্র মেজাজের কথা জানত। তাই ইনসান চৌধুরী যখন তাকে জামাই করার কথা জানালেন তখন বলল, আমি আপনার মেয়ের অনুপযুক্ত। তা ছাড়া ঘরজামাই হয়ে থাকা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

ইনসান চৌধুরী ভাবতেই পারেন নি, হারেস অমত করবে। রাগে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। একসময় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এর পরিণাম চিন্তা করেছ?

জি করেছি, আমার চাকরি থাকবে না।

একই কণ্ঠে ইনসান চৌধুরী বললেন, শুধু চাকরি নয়, প্রাণ নিয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে পারবে না। তারপর নরম সুরে বললেন, তোমার মতো ছেলেই চৌধুরী বংশের জামাই হওয়ার উপযুক্ত। আমার পরে তুমিই হবে এই বংশের কর্ণধার। তারপর অনেক কিছু প্রলোভন দেখিয়ে হারেসকে রাজি করান।

ইনসান চৌধুরী কাছের জমিগুলো নিজের লোকজন দিয়ে চাষ করালেও দূরের জমিগুলো সেই গ্রামের লোকজনদের পত্তনি দিয়েছেন। যে বছর ফসল না হত, সে বছর ইনসান চৌধুরী নিজের লোকজন দিয়ে জোর-জুলুম করে তাদের কাছে ফসল আদায় করতেন। ফসল দিতে না পারলে গরু-বাছুর, ছাগল নিয়ে চলে আসতেন। এসব ব্যাপার ছাড়াও ইনসান চৌধুরীর মদ ও মেয়ের নেশা ছিল। তবে গ্রামের মেয়েদেরকে নিয়ে কিছু করতেন না। ঢাকা থেকে বাঈজী আনাতেন।

হারেস ম্যানেজার হয়ে আসার পর এইসব দেখে শুনে ইনসান চৌধুরীর উপর দিন দিন খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেও সাহসের অভাবে প্রতিবাদ করতে পারে নি। জামাই হওয়ার পর একবার দূরের এক গ্রামের গরিব চাষি ফসলের ভাগ দেয় নি বলে তাকে লোকজন ধরে এনে এমন মার মেরেছিল যে, সেই গ্রামের লোকেরা তাকে পাটার করে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন হারেস বাধা দিয়েছিল বলে লোকটা বেঁচে গিয়েছিল, নচেৎ মারা যেত।

কথাটা ইনসান চৌধুরী জেনে হারেসকে ভবিষ্যতে এরকম না করার জন্য সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, আমার অবর্তমানেও করবে না।

সেদিন হারেস শ্বশুরের সামনে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চাষিদের উপরে নির্মম অত্যাচার আর করতে দেবে না।

দিন দিন স্ত্রীর উপরও হারেস অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। সে যেন তাকে ঠিক স্বামীর আসনে গ্রহণ করতে পারে নি। তার কথামতো না চলে, নিজের ইচ্ছা মতো চলে। যখন হারেস স্ত্রীকে সংযত হয়ে চলার জন্য বোঝাত তখন ফায়েজুন্নেসা বলতেন, যারা ঘরজামাই থাকে, তাদের কথা স্ত্রীরা শোনোই না, বরং স্ত্রীদের কথা তাদেরকে মেনে চলতে হয়। এনিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কলহ হত।

দিনের পর দিন স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে হারেস একদিন শ্বশুরের কাছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।

ইনসান চৌধুরী উল্টো জামাইকে দোষারোপ করে বললেন, যে নিজের স্ত্রীকে বশে রাখতে পারে না, সে কাপুরুষ।

শ্বশুরের কথা শুনে হারেস নির্বাক হয়ে ভাবল, চৌধুরী বংশের জামাই হয়ে যে ভুল করেছে, তা জীবনে শুধরাতে পারবে না। চিরকাল তাকে অশান্তির

আগুনে জ্বলতে হবে। তবু হাল ছাড়ল না, স্ত্রী কখন কি করে, কোথায় যায়, একটা বিশ্বস্ত চাকর সামসুকে লক্ষ্য রাখতে বলল।

সামসু অনেক দিন থেকে আছে। ফায়জুন্নেসার সবকিছু জানে। বলল, লক্ষ্য রাখার দরকার নেই। মালিকদের সবকিছু শুধু আমি নই, সব চাকর চাকরানিরাও জানে। কিন্তু আমাদের মুখ খোলা নিষেধ। যদি কেউ খোলে, তা হলে তাকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়। এরকম ঘটনা ঘটতে দেখে আমরা বোবা হয়ে থাকি। আপনাকে আমরা সবাই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করি, তাই আপনার জন্য আমরা দুঃখ পাই। তবু মুখ খুলতে পারব না। তবে এতটুকু বলতে পারি, তারপর মালিক কন্যার মন দেয়া নেয়ার কথা বলে বলল, এখনও তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে নিজে লক্ষ্য রাখলে সত্য মিথ্যা জানতে পারবেন।

চাকরের কথা শুনে হারেস সিদ্ধান্ত নিল, সত্য মিথ্যা যাচাই করার দরকার নেই, যেমন করে হোক এখান থেকে পালিয়ে যাবে।

এর কয়েকদিন পর ইনসান চৌধুরীর লাশ জলমহলে পাওয়া গেল।

শ্বশুর মারা যাওয়ার পর হারেসের উপর চৌধুরী স্টেটের ও সংসারের দায়-দায়িত্ব পড়ে গেল। পালাবার চিন্তা স্থগিত রেখে সে সব সামলাতে লাগল।

তারপর একদিন মেয়ে যাতে মায়ের মতো না হয় সে জন্যে হারেস ছয় বছরের স্বপ্নাকে ঢাকায় এক হোমে রেখে লেখাপড়া করার ব্যবস্থা করে এল।

ফায়জুন্নেসা মনে মনে খুশি হলেও মুখে বলল, কাজটা তুমি ভালো কর নি।

হারেস বলল, তোমার কাছে ভালো না হলেও আমি স্বপ্নার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই করেছি।

ফায়জুন্নেসা আর কিছু বলল না।

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিভাবে চার-পাঁচ বছর কেটে গেল হারেস বুঝতে পারল না।

বাবা মারা যাওয়ার পর ফায়জুন্নেসা বছর দুই একটু সংযত ছিল। তারপর যত দিন যেতে লাগল তত আগের মতো হয়ে উঠল।

চাকরের কাছে স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কথা জানার পর থেকে হারেস আলাদা রুমে ঘুমাত এবং তার সংশ্রব থেকে দূরে থাকত। এমন কি তার খোঁজ-খবরও রাখত না। ফলে ফায়জুন্নেসা আরো বেপরওয়া হয়ে উঠে।

চাকর সামসু বয়স্ক লোক। হারেসকে ভীষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ওনার মনের কষ্টও বোঝে। তাই মালেকিনকে আগের মতো হয়ে উঠতে দেখে একদিন হারেসকে বলল, আগে রাতের অন্ধকারে মালেকিনের প্রেমিক এলেও ইদানিং বেলা তিনটের দিকে আসে। মালেকিন গেস্টরুমে তার সঙ্গে দেখা করেন।

হারেস জিজ্ঞেস করল, প্রতিদিন আসে?

সামসু বলল, না, যেদিন আপনি অন্য গ্রামে তদারকী করতে যান, সেদিন আসে।

হারেস কথাটা সত্য কিনা যাচাই করার জন্য একদিন অন্য গ্রামে যাওয়ার কথা বলে বেলা দশটার দিকে লোকজন সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রতিবারে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। আজ লোকজনদেরকে শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে ফিরে এল। তারপর স্ত্রীর রুমের জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল, নেই। নিচ তলায় এসে গেস্ট রুমের দরজা বন্ধ দেখে নক করল।

ফায়জুন্নেসার প্রেমিকের নাম আজিজ। লম্বা চওড়া শরীর, দেখতে খুব হ্যান্ডসাম। তারা প্রেমকেলীর প্রস্তুতি নেয়ার আগে দরজায় নক হতে শুনে আজিজ ফায়জুন্নেসার দিকে তাকাল।

ফায়জুন্নেসা দরজায় নক হতে শুনে রেগে লাল হয়ে গেল। কারণ সে জানে কারো ঘাড়ে দু'টো মাথা নেই যে, এসময়ে এই রুমের দরজা নক করবে। বারবার নক হতে শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দরজা খুলে স্বামীকে দেখে চমকে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?

হারেস তার কথার উত্তর না দিয়ে আজিজের আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? এ সময়ে এখানে কেন?

আজিজ কিছু বলার আগে ফায়জুন্নেসা বলল, ও পাশের গ্রামের ছেলে। আমরা একসঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়েছি। ওকে আমিই ডেকে পাঠিয়েছি।

হারেস কিছু না বলে সেখান থেকে নিজের রুমে চলে গেল।

স্বামীর কাছে ধরা পড়ে ফায়জুন্নেসা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। ভাবল, হারেস যদি মাকে কথাটা জানায়, তা হলে মা তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাই একদিন আজিজের কাছে পরামর্শ চাইল।

আজিজ এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, বলল, তুমি কোনো দুশ্চিন্তা করো না, যা করার আমি করব।

তুমি কি ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাও?

তুমি বললে তা করতে পারি।

না-না, তা করো না। বরং এমন কিছু কর, সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

ঠিক আছে, কি করব না করব চিন্তা ভাবনা করে তোমাকে জানাব।

কয়েকদিন পরে হারেসের লাশ ঐ একই জলমহলে পাওয়া গেল।

সবাই ভাবল, এটা জিনেদেরই কাজ। তাই কেউ উচ্চ বাচ্য করল না। এমন কি লুৎফা বেগম ও ফায়জুন্নেসাও তাই ভাবলেন।

হারেস মারা যাওয়ার পাঁচ ছ'মাস পরে ফায়জুন্নেসা আজিজকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, তোমাকে আর কিছু করতে হল না।

আজিজ মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, আমি কিছু করার আগেই জিনেরা করে ফেলল।

তুমি জিনেদের ভয় কর না।

কেন, ভয় করব কেন?

যদি তাদের আক্রোশ তোমার উপর পড়ে?

আমার কাছে এমন জিনিস আছে, জিনেরা আমার ধারে কাছে আসতে সাহস পাবে না। আমার জন্য তুমি কোনো চিন্তা করো না।

তারপর থেকে তাদের গোপন প্রেমলীলা চলতে লাগল। আজিজ প্রেমের ফাঁদে ফেলে স্টেটের ম্যানেজার করাতে বাধ্য করাল ফায়জুন্নেসাকে।

জামাই মারা যাওয়ার পর চাকরানিদের মুখে আজিজের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কের কথা শুনে লুৎফা বেগম একদিন রাগারাগি করে বলেছিলেন, তুই যে পথে চলছিস, তা শয়তানের পথ। তুই কি আল্লাহকে মানিস না? তাঁকে ভয়ও করিস না? যদি তাই হয়, তা হলে অতি অল্পদিনের মধ্যে তার ফল পাবি। কথায় আছে, " আল্লাহর মার দুনিয়ার বার।" তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি যেমন অত্যন্ত দয়াশীল তেমনি কঠোর আযাবদাতা। তুই যে অন্যায় করেছিস, তার ফল তোকে ভোগ করতেই হবে। তোকে দিয়েই আল্লাহ এই বংশের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন এবং ভবিষ্যতে সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার জন্য তোকে একটা মেয়েও দিয়েছেন। সেই মেয়ের কথাও চিন্তা করবি না?

মায়ের কথা শুনে ফায়েজুন্নেসা চুপ করে থাকলেও স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। কিছুদিন পর আজিজকে স্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করে।

লুৎফা বেগম চাকরানিদের মুখে সেকথা জানতে পেরে মেয়েকে আরেক দফা বকাবকি ও সাবধান করে নসিহত করেন। কিন্তু ফায়জুন্নেসা মায়ের কথায় কর্ণপাত করে নি।

আজিজ সাধারণ ঘরের ছেলে বলে ইনসান চৌধুরী তার ভালবাসার মূল্য দেন নি। তাই ওনার উপর প্রচণ্ড রাগ ছিল আজিজের। বিয়ের পরেও যখন ফায়জুন্নেসা চিঠি দিয়ে জানাল, তাকে আজীবন ভালবাসবে এবং কিভাবে তাদের গোপন অভিসার চলবে তখন আজিজ চৌধুরী ফায়জুন্নেসার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলল। তারপর ইনসান চৌধুরী মারা যাওয়ার পর হারেসকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিলে ফায়জুন্নেসা রাজি হয় নি। হারেস মারা যাওয়ার পর ম্যানেজারী করার সময় একদিন ফায়জুন্নেসাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল।

ফায়জুন্নেসা বললেন, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমাকে ম্যানেজার করেছি বলে মা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে আমার সাথে ভীষণ রাগারাগি করেছে। একদিন না একদিন মায়ের রাগ ঠাণ্ডা হবে। তখন করা যাবে। চিন্তা করো না, আমি তো চিরকাল তোমারই থাকব।

ফায়জুন্নেসার চেয়ে তার বাবার সম্পত্তির উপর আজিজের লোভ বেশি। তাই তার কথা মেনে নেয়।

কয়েক বছর ম্যানেজারী করে আজিজ নিজের আখের গুছিয়ে নিল। তাতেও তার মন ভরল না। সে জানে ফায়জুন্নেসাকে বিয়ে করতে পারলে চৌধুরী স্টেট তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। চৌধুরী বংশের একমাত্র প্রদীপ স্বপ্নাকে কৌশলে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারলে পুরো স্টেটের মালিক হয়ে যাবে। ইদানিং যেন ফায়জুন্নেসা আগের মতো তার সঙ্গে অভিসার করছে না। শরীর খারাপের কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবল, তার প্রতি ভালবাসার টান কমে যাচ্ছে। এইসব চিন্তা করে একদিন ফায়জুন্নেসার কাছে বিয়ের কথা তুলে বলল, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে বলতে পার?

ফায়জুন্নেসা বললেন, মাকে কথাটা বলেছিলাম, শুনে বলল, তোর বাবা যাকে জামাই করল না, তাকে আমি কিছুতেই জামাই করতে পারব না। আর তুই যদি আমার কথা না মানিস, তা হলে যে দিন শুনব তাকে বিয়ে করেছিস, সেদিন আমার মরা মুখ দেখবি। এখন তুমিই বল, আমি কি করব?

আজিজ বলল, মা যখন আত্মহত্যার কথা বলেছেন তখন আমরাই তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারি।

এখন ফায়জুন্নেসার যৌবন ভাটার দিকে। তা ছাড়া এতদিনে ফায়জুন্নেসা জানতে পেরেছে, আজিজ স্টেটের তহবীল তসরুফ করে আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। আরও বুঝতে পেরেছে, বাবা তার সঙ্গে বিয়ে দেয় নি বলে প্রেমের অভিনয় করে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। মেয়ে স্বপ্নার কথা চিন্তা করেও আজিজের প্রতি তার ভালবাসার টান কমতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে মায়ের নসিহতও মনে পড়ে, "তুই যে অন্যায়ের পথে চলেছিস, অচিরেই আল্লাহ তার প্রতিফল তোকে দেবেন।" তাই আজিজের সঙ্গে অভিসার কমিয়ে দিয়েছে। এখন তার মুখে মাকে পরপারে পাঠাবার কথা শুনে মনে মনে চমকে উঠে চিন্তা করল, তা হলে কি আজিজ হারিসকে মেরে জল মহলে ফেলে দিয়েছে?

তখন তার মন বলে উঠল, আজিজকে চিনতে তুমি ভুল করেছ। স্ত্রী ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও যে তোমাকে দীর্ঘ দিন ভোগ করেছে, সে-ই রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে, এখন সমস্ত স্টেট গ্রাস করার জন্য তোমার মাকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে, সে যে কত বড় ধূর্ত পাপী, একবারও কি চিন্তা করবে না?

তাকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে আজিজ যেন তার মনের কথা বুঝতে পারল। বলল, এতক্ষণ কি ভাবছ? মনে হচ্ছে, আমার পরামর্শ তোমার মনঃপুত হয় নি?

বিবেকের চাবুকে ফায়জুন্নেসার জ্ঞানের চোখ খুলে গেছে। বলল, হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ, তোমার পরামর্শটা আমার মনঃপুত হয় নি। শুধু তাই নয়, তোমার আসল উদ্দেশ্য আমি ধরে ফেলেছি। আজ এখনই তোমাকে বরখাস্ত করলাম। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি চলে যাও, আর কখনও এমুখো হবে না।

আজিজ খুব রেগে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে উঠে বলল, চমৎকার, কি দারুণ তোমার অভিনয়?

ফায়জুন্নেসা রাগের সঙ্গে বলল, না, অভিনয় নয়, যা সত্য তাই বলেছি।

তা হলে তো আমার আসল উদ্দেশ্যের কথা শুনতেই হয়।

নিজেই তো জান, আমার কাছে শুনতে চাচ্ছ কেন? আমি বলব না।

যদি বলি বলতেই হবে?

তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ? ভুলে যেও না, তুমি চৌধুরী স্টেটের একজন কর্মচারী। মালিকের সঙ্গে বেয়াদবী করার শাস্তি নিশ্চয় জান? কোনো উচ্চ-বাচ্চ্য না করে চলে গেলেই ভালো করবে। নচেৎ বলে থেমে গিয়ে ফায়জুন্নেসা তার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাল।

এই দৃষ্টির অর্থ আজিজ জানে। ইনসান চৌধুরীর ভয়ালদর্শন কয়েকজন লেঠেল ছিল। আরও ছিল কয়েকজন ভয়ালদর্শন পিস্তলধারী। ইনসান চৌধুরী যার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাতেন। হয় লেঠেলরা তাকে লাঠিপেটা করে মেরে ফেলত অথবা পিস্তলধারী কেউ একজন তাকে গুলি করে মেরে ফেলত। সেই সব লেঠেল ও পিস্তলধারীরা এখনও আছে।

এখন ফায়জুন্নেসাকে অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে দেখে আজিজ ভয় পেয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

তারপর আজিজ আর কখনও চৌধুরী বাড়ির ত্রিসীমানায় না গেলেও একের পর এক তাদের ক্ষতি করে চলেছে। সেও কয়েকজন লেঠেল ও পিস্তলধারী লোক রেখেছে। একবার চৌধুরীদের পত্তনী দেয়া জমির ধান লুট করতে গিয়ে উভয় পক্ষের কয়েকজন লেঠেল ও পিস্তলধারী হতাহত হয়েছে।

আজিজকে বরখাস্ত করার পর ফায়জুন্নেসা বেশ কয়েকজন ম্যানেজার রেখেছেন। তাদেরকে আজিজের অস্ত্রধারী লোকেরা ভয় দেখিয়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে। যারা না গিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে, তাদেরকে মেরে ফেলেছে। তাই এবারে সুটিং ও ফাইটিং জানা ম্যানেজার পোস্টের জন্য কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন।

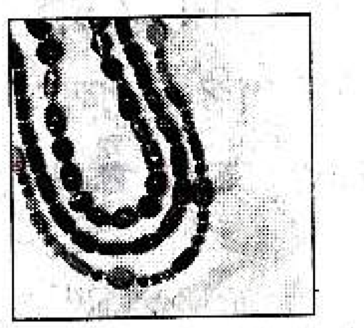

কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখে ঢাকা থেকে একজন এসেছে শুনে ফায়জুন্নেসা কিছুক্ষণ আগে এসেছেন। তার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য পেপার ওয়েট ঠুকে শব্দ করেন। তারপর তাকে ঐভাবে তাকাতে দেখে বললেন, মনে হচ্ছে আপনি খুব অবাক হয়েছেন। এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ওটা অনেক আগের ফটো। পাশের লোকটা আমার স্বামী আর ছোট মেয়েটি আমাদের একমাত্র সন্তান স্বপ্না। তারপর মৃদু হেসে বললেন, এখন অবশ্য অনেক বড় হয়েছে। ঢাকা ভার্সিটিতে জুওলজিতে মাস্টার্স করে পি.এইচ.ডি. করতে আমেরিকা গেছে।

সালাম দেয়া হয় নি মনে পড়তে ফায়সাল তাড়াতাড়ি সালাম দিল।

ফায়জুন্নেসা সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।

ফায়সাল বসার পর হঠাৎ খেয়াল করল, ভদ্রমহিলার শরীরে এতটুকু বয়সের ছাপ পড়ে নি। বাঁধান শরীর, সুন্দর স্বাস্থ্য। গায়ে ওড়না থাকলেও পুরুষ্ঠ বক্ষ দু'টো দেখে লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে নিল।

ফায়জুন্নেসা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সব কাগজপত্র এনেছেন?

জি, এনেছি। তবে সেগুলো দেখাবার আগে জানতে চাই, বর্তমানে আপনিই কি চৌধুরী স্টেটের মালিক?

তা জানা কি আপনার খুব প্রয়োজন?

নিশ্চয়। যিনি আমাকে চাকরি দেবেন ওনার পরিচয় জানা উচিত নয় কি?

হ্যাঁ, আমিই চৌধুরী স্টেটের একমাত্র মালিক ফায়জুন্নেসা। এবার নিশ্চয় কাগজপত্র দেখাবেন?

ফায়সাল ব্রিফকেস খুলে কাগজপত্র বের করে টেবিলের উপর রাখল।

ফায়জুন্নেসা সেগুলো দেখে বললেন, ঠিক আছে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এত অল্প বয়সে দাড়ি রেখেছেন কেন?

দাড়ি রাখা সুন্নত হলেও ফকিহগণ ওয়াজেব বলেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলমান পুরুষদের দাড়ি রাখা উচিত, এখানে বয়সের কথা অবান্তর।

শুনুন, এখানে চাকরি করার যে শর্তটা পেপারে দেয়া সম্ভব নয় বলে দিই নি সেটা হল, আমি যেভাবে যা কিছু করতে বলব, দ্বিধাহীনচিত্তে করবেন। এতটুকু প্রতিবাদ করতে পারবেন না।

কিন্তু আপনি যদি অন্যায় কিছু করতে বলেন, তা হলে?

ফায়জুন্নেসা রেগে উঠে গম্ভীরস্বরে বললেন, তা হলেও করতে হবে।

ওনার রাগকে পাত্তা না দিয়ে ফায়সাল বলল, আর যদি কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করতে বলেন?

ফায়জুন্নেসা আরও রেগে উঠে বললেন, তাও করতে হবে।

ওনার রাগকে এবারও পাত্তা না দিয়ে ফায়সাল বলল, তা হলে আপনিও শুনে রাখুন, আমি জীবনে কখনও কোনোরকম এতটুকু অন্যায় কিছু করি নি। তাই আপনার কাছে চাকরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষুনি বিদায় হচ্ছি বলে কাজগপত্রগুলো ব্রিফকেসে ভরে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ফায়জুন্নেসা কঠিন কণ্ঠে বললেন, নিজেকে কি ভাবেন আপনি?

মানুষের ঘরে যখন জন্মেছি তখন মানুষই ভাবি।

মানুষ মাত্রই মানুষের ঘরে জন্মায়, জন্তু জানোয়ারের ঘরে জন্মায় না।

কিন্তু মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েও অনেকের স্বভাব-চরিত্র জন্তু-জানোয়ারের মতো হয়। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যেমন শুধু নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝে না, অনেক মানুষ তেমনি নিজের স্বার্থের জন্য ন্যায় অন্যায়ের বাদ বিচার করে না। যাকগে, এসব কথা বলে লাভ নেই। এখন রিকশা পাব বলে মনে হয় না, হেঁটেই স্টেশনে যেতে হবে। কথা শেষ করে ফায়সাল যেতে উদ্যত হলে ফায়জুন্নেসা কঠিন কণ্ঠে বললেন, চৌধুরী বাড়িতে এসে কেউ নিজের ইচ্ছায় চলে যেতে পারে না।

ফায়সালের তখন আসার সময় স্টেশনে বৃদ্ধের কথা মনে পড়লেও ভয় পেল না। বলল, কেউ না পারলেও আমি পারব ইনশাআল্লাহ বলে দু'পা এগিয়ে দেখল, দরজায় তেলচকচকে লাঠি হাতে একজন ভয়ালদর্শন লোক তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। লোকটার গায়ের রং মিশমিশে কালো, ইয়া বড় মোচ, দেখতে যেমন বিশ্রি, তার হাসিটাও তেমনি বিশ্রি। তাকে দেখে একটা ভয়মিশ্রিত শিহরণ ফায়সালের শরীরে খেলে গেল। তার মন তাকে সাবধান করল, তুমি লাঠিখেলা জান না, ঐ লাঠির একটা বাড়ি খেলে মা বলার আগেই শেষ হয়ে যাবে। তড়িৎ বুদ্ধি খাটিয়ে লোকটাকে বলল, একজন নিরস্ত্র মানুষকে অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করায় কোনো বাহাদুরী নেই।

ফায়সালের কথা শেষ হওয়া মাত্র লোকটা লাঠি ফেলে দিয়ে মোচে তা দিতে লাগল।

ফায়সাল ব্রিফকেসটা মারার ভঙ্গিতে তার দিকে ছুঁড়ে দিতে লোকটা যখন খেলনার মতো লুফে নিতে গেল, ঠিক তখনই ছুটে এসে তার তলপেটের নিচে প্রচণ্ড জোরে একটা পা দিয়ে আঘাত করল।

লোকটা ব্রিফকেস ধরার আগেই ফায়সালের লাথি খেয়ে ব্যথায় নীল হয়ে তলপেট ধরে বসে পড়ল। আর ব্রিফকেসটা তার মাথায় বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ল।

ফায়সালকে তার দিকে এগোতে দেখে ফায়জুন্নেসা খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, থাক, ওকে আর আঘাত করবেন না। ব্রিফকেসটা নিয়ে এসে বসুন। চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজার হওয়ার উপযুক্ত কিনা জানার জন্য আপনার ইন্টারভিউ নিলাম। আপনি ফুলমার্ক পেয়ে পাশ করেছেন। চাকরির জন্য যে শর্তের কথা বলেছি সেটাও ইন্টারভিউর প্রশ্ন ছিল। তারপর দু'হাতে তালি বাজালেন।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক এসে লাঠিওয়ালা লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল।

ফায়জুন্নেসার কথা শুনে ফায়সাল অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাই দেখে ফায়জুন্নেসা মৃদু হেসে বসতে বলে বললেন, ইন্টারভিউটা বেশ কঠিন হয়েছে, তাই না? কি করব বলুন, মেয়ে হয়ে এতবড় স্টেট চালান কত কঠিন, আশা করি, কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারবেন। তারপর আবার তালি বাজালেন।

এবার আধা বয়সী দু'জন মেয়ে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। ফায়সালকে দেখিয়ে ফায়জুন্নেসা তাদেরকে বললেন, ইনি নতুন ম্যানেজার, তোমরা ওনাকে ওনার রুমে নিয়ে গিয়ে সবকিছু দেখিয়ে দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা কর। তারপর ফায়সালের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল সকালে আপনার কাজ বুঝিয়ে দেয়া হবে। এখন ওদের সঙ্গে যান।

রুমে এসে ফায়সাল খুশি হল। বেশ বড় রুম, ডবল খাট, খাটের বিছানাপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তিনটে জানালা, একটা দক্ষিণ দিকে, একটা পূর্ব দিকে ও একটা উত্তর দিকে। খাটের পরে প্রায় পাঁচ হাতের মতো ফাঁকা মেঝে। একপাশে একটা টেবিল ও দু'টো চেয়ার, বুকসেল্ফ ও কাপড় রাখার স্টিলের আলনা। খাট বরাবর পূর্ব দিকের জানালার পাশে ড্রেসিং টেবিল আর উত্তর পাশে বাথরুমের দরজা। বাথরুমসহ পুরোরুম মোজাইক করা। এমন কি দেয়ালও মোজাইক করা। ফায়সালের মনে হল, পুরো বিল্ডিংটাই হয় তো মোজাইক করা।

কাজের মেয়ে দু'টো তাকে রুমে পৌঁছে দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল তখন ফায়সাল তাদেরকে বলে দিয়েছিল, এক ঘন্টা পরে খাবার নিয়ে আসতে। রুমে ঢুকে একজন কাজের মেয়ে লাইট ও ফ্যানের সুইচ অন করে দিয়েছিল। ফায়সাল ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে জামা কাপড় পাল্টে বাথরুমে গোসল করতে ঢুকল। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায পড়ে ছ'টার বাসে উঠে রংপুরে পৌঁছায়। তারপর ট্রেনে করে নীলফামারী স্টেশনে নেমে রিকশায় এসেছে। এত দীর্ঘ পথ জার্নি করে সে খুব ক্লান্ত। তাই শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে আধ ঘন্টা ধরে গোসল করল। তারপর সঙ্গে আনা নামাযের মসাল্লা বিছিয়ে এশার

নামায পড়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে যখন মাথা আঁচড়াচ্ছিল তখন দরজার বাইরে থেকে একজন কাজের মেয়ের গলা পেল, "ম্যানেজার সাহেব দরজা খুলুন, খাবার নিয়ে এসেছি।"

ফায়সাল দরজা এমনি ভিড়িয়ে বাথরুমে ঢুকেছিল। বলল, দরজা খোলা আছে, খাবার দিয়ে যান।

দু'জন খাবার নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল, তারপর একজন চলে গেল আর অন্যজন মেঝের একপাশে মুখ নিচু করে বসে রইল।

ফায়সাল রুমে আসার সময় মানসিক টেনসানে ছিল বলে মেয়ে দু'টোকে তেমন লক্ষ্য করে নি। এখন তাদেরকে দেখে মনে হল, এরা ঠিক কাজের মেয়ে নয়, কোনো ভদ্র ঘরের মহিলা। বয়স প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ, দেখতে শুনতেও ভালো । একজন চলে যাওয়ার পর ফায়সাল সঙ্গে আনা দস্তরখান মেঝেয় বিছিয়ে টেবিল থেকে খাবারগুলো নামাতে গেলে বসা মেয়েটা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি বসুন, আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

খাবারের মেনু দেখে ফায়সালের মনেই হল না, অজপাড়াগাঁয়ে এসেছে। খাওয়া শেষ হতে মেয়েটি যখন থালা বাটি গুচ্ছাছিল তখন জিজ্ঞেস করল, এখানে কতদিন কাজ করছেন?

কাজের মেয়েদেরকে কেউ আপনি করে বলে না। নতুন ম্যানেজারকে বলতে শুনে মেয়েটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

কি হল? আমার কথার জবাব দিলেন না যে?

মেয়েটি মুখ নিচু করে বলল, আমার জন্ম এখানেই?

তারমানে আপনার মাও এখানে কাজ করতেন?

মেয়েটি শুধু মাথা নাড়াল।

আর আপনার সঙ্গে যিনি এসেছিলেন?

আমার মতো ওরও জন্ম এখানে?

কি নাম আপনার?

আকলিমা।

নাম শুনে ফায়সাল অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার এক খালার নাম আকলিমা। উনি মারা গেছেন। আমি আপনাকে খালাম্মা বলে ডাকব।

আঁৎকে উঠে আকলিমা বলল, না-না, অমন কাজ করবেন না। মালেকিন জানলে আমাকে আস্ত রাখবেন না বলে ত্রস্তপদে চলে গেল।

ফায়সাল বুঝতে পারল, ফায়জুন্নেসা খুব কড়া মহিলা। চাকর চাকরানিরা ওনাকে ভীষণ ভয় পায়।

পরের দিন সকালে আকলিমা নাস্তা নিয়ে এল না, অন্য মেয়েটি নিয়ে এল।

ফায়সাল জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কি?

এই মেয়েটির নাম তাসলিমা। নাম না বলে বলল, দেখুন আমরা বাড়ির চাকরানি। আমাদেরকে আপনি করে বলবেন না, কোনো কিছু জিজ্ঞেসও করবেন না। আকলিমা বোকা। তাই কাল সে ভুল করলেও আমি করব না।

ফায়সাল বুঝতে পারল, এরা চাকরানী হলেও শিক্ষিতা। বলল, আমার তো মনে হয়, আকলিমা খালাম্মা কোনো ভুল করেন নি। আর আমি তো ছোট বড় সবাইকেই আপনি করে বলি।

সবাইকে বললেও আমাদেরকে বলবেন না। মালেকিন জানতে পারলে আপনার বিপদ হবে।

ফায়সাল মৃদু হেসে বলল, বিপদ হোক, তবু সবাইকেই আপনি করে বলব।

তাসলিমা আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। ফায়সালের নাস্তা খাওয়া শেষ হতে বাসন পেয়ালা নিয়ে চলে গেল।

চৌধুরী বাড়ির সব থেকে পুরানো চাকর হাসেম। বয়স ষাটের উপর। লম্বা চওড়া পেটাই শরীর, গায়ের রঙ শ্যামলা। এত বয়স হয়েছে দেখলে মনে হয় না। দু'চারজন যুবক তার কাছে কিছুই না। লাঠি খেলায় ও শুটিংএ পারদর্শী। তার কাছে সব সময় একটা রিভলবার থাকে। তবে সে কথা লুৎফা বেগম ও ফায়জুন্নেসা ছাড়া কেউ জানে না। সে হল চাকর-চাকরানিদের সর্দার।

নাস্তা খেয়ে ফায়সাল পাজামা পাঞ্জাবি পরে বসে বসে ভাবছিল, এখানে তাকে কি কাজ করতে হবে। কি জন্যে আগের ম্যানেজার খুন হলেন? এমন সময় হাসেম এসে বলল, চলুন, মালেকিন ডাকছেন।

ফায়সাল তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল, এই লোক ঠাণ্ডা মাথায় যে কোনো লোককে খুন করতে পারে। সালাম দিয়ে বলল, আপনার পরিচয়?

হাসেম সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমার পরিচয় মালেকিন দেবেন।

হাসেমের সঙ্গে ফায়সাল যে রুমে ঢুকল সেটা একটা হল রুম। আট দশজন লোক টেবিল চেয়ারে বসে কাজ করছে। একপাশে দশফুট বাই বারফুটের কাচের পার্টিশান দেয়া একটা রুম হলেও ভিতরে কি আছে না আছে ফায়সাল দেখতে পেল না। দরজায় দামি পর্দা ঝুলছে।

ফায়সালকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে হাসেম কাচের রুমটা দেখিয়ে বলল, ওখানে মালেকিন আছেন, আসুন। তারপর দরজার কাছে এসে বলল, আপনি ভিতরে যান।

ফায়সাল পর্দা ফাঁক করে বলল, আসতে পারি?

ফায়জুন্নেসা তার দিকে তাকিয়ে বলল, আসুন।

ফায়সাল ঢুকে সালাম দিল।

ফায়জুন্নেসা সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বলে কলিং বেল বাজালেন।

হাসেম ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

ফায়জুন্নেসা হাসেমের পরিচয় দিয়ে ফায়সালকে বললেন, এই লোক আপনাকে চৌধুরী স্টেটের যেখানে যা আছে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবে এবং কিভাবে সবার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে জানাবে। মোট কথা ও যা বলবে, বিনা দ্বিধায় তা আপনাকে করতে হবে। বাই দা বাই, আপনার কি রিভলবার বা পিস্তল আছে?

ফায়সাল বলল, না।

ঠিক আছে, আপনাকে একটা রিভলবার দেয়া হবে, তবে এখন নয়, যখন বুঝব দেয়া দরকার তখন দেব।

আমি এসেছি চাকরি করতে, রিভলবার দিয়ে কি করব? ওসব আমার দরকার নেই।

ফায়জুন্নেসা বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, কথার মাঝখানে কথা বলবেন না। আমার কথা শেষ হওয়ার পর যা বলার বলবেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি লাঠিখেলা জানেন?

জি, না।

সাজ্জাদ লেঠেল আপনার সঙ্গে সব সময় থাকবে। তাকে বলে দেব তার কাছে শিখে নেবেন। শুটিং নিশ্চয় জানেন?

জি, জানি।

ফায়জুন্নেসা হাসেমকে বললেন, মৃণালবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। একটু পরে মৃণাল এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, সালাম মালেকিন।

ফায়জুন্নেসা ফায়সালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মৃণালবাবুকে বললেন, ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে অফিস স্টাফদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে কার কি কাজ জানিয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে ম্যানেজার সাহেবকেও ওনার কাজ বুঝিয়ে দেবেন। তারপর ফায়সালকে বললেন, উনি অফিসের বড় বাবু। অফিসের যাবতীয় কাজ ওনার সঙ্গে পরামর্শ করে করবেন। মৃণালবাবু, এবার আপনি আসুন।

মৃণালবাবু চলে যাওয়ার পর ফায়সালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আশ-পাশের গ্রামের কিছু লোক অনেকদিন থেকে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে। তারই জের হিসাবে আমাদের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে। সে সময় আমরা প্রতিরোধ করি। ফলে উভয় পক্ষের অনেকে হতাহত হয়। আবার কোনো কোনো ম্যানেজারকে ক্যাপচার করে স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টাও করে। অবশ্য কোনো ম্যানেজারকেই ক্যাপচার করতে পারে নি। তাই হয় তাকে মেরে ফেলে, নচেৎ এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কেন রিভলবার রাখার ও লাঠি-খেলা শেখার কথা বললাম।

ফায়সাল বলল, শত্রুতা মিটিয়ে মিত্রতা করা যায় না?

ফায়জুন্নেসা রেগে উঠে বললেন, সেটা আমাদের ব্যাপার আমরা দেখব, আপনি এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে শত্রুতা জিইয়ে রাখা উচিত নয়। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য তো নয়ই। হাদিসে আছে, আমাদের নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "হে মুসলমানগণ আমার পরে তোমরা কাফেরদের কার্যকলাপে লিপ্ত হইও না যে, তোমরা একে অপরকে হত্যা করতে আরম্ভ কর।"[১]

আর আল্লাহ কুরআন পাকে বলিয়াছেন, "আর যদি মুসলমানদের দুই দল পরস্পর (ঝগড়া-বিবাদ) যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা ও পুনর্মিলন করিয়া দাও, অনন্তর যদি তাহাদের এক দল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর-যেই দল বাড়াবাড়ি করে যে পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরিয়া আসে, অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সহিত সন্ধি করাইয়া দাও; আর সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিও; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বানদিগকে পছন্দ করেন।"[২]

এখন আপনিই বলুন, মুসলমানদের মধ্যে কি শত্রুতা থাকা উচিত?

কুরআন হাদিসের কথা শুনে ফায়জুন্নেসা আরো রেগে ওঠে বললেন, মনে রাখবেন, আমার এখানে আপনি চাকরি করতে এসেছেন, ওয়াজ করার জন্য নয়। আর কখনও যদি এসব ব্যাপার নিয়ে বলেন, তা হলে.....বলে রাগে কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

ফায়সাল ওনার রাগকে গ্রাহ্য করল না। মৃদু হেসে বলল, একজন মানুষ জেনে অথবা না জেনে যদি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়, তা হলে অন্য মানুষের উচিত তাকে বাধা দেয়া। যদি না দেয়, তা হলে সে মানুষই না। সে ব্যাপারেও আল্লাহ কুরআনপাকে বলিয়াছেন, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল এইরূপ থাকা আবশ্যক, যেন তাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং নেক কাজের আদেশ করিতে ও মন্দ কাজের বারণ করিতে থাকে, আর এইরূপ লোক পূর্ণ সফলকাম।"[৩]

---

(১) বর্ণনায় : হযরত জরীর (রাঃ) - বুখারী।
(২) সূরা - হুজুরাত, আয়াত - ৯, পারা - ২৬।
(৩) সূরা-আল-ইমরান, আয়াত-১০৪, পারা-৪।

একজন মুসলমান হয়ে যদি কুরআনের আদেশ না মানি, তা হলে কাল হাশরের মাঠে আল্লাহর কাছে মুখ দেখাব কি করে?

ফায়েজুন্নেসা ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। হাসেমকে ইশারায় কিছু বলে সেখান থেকে চলে গেলেন।

হাসেম রাগের সঙ্গে ফায়সালকে বলল, এই যে ম্যানেজার সাহেব, মালেকিন নিষেধ করা সত্ত্বেও ওয়াজ করছেন কেন? আর কখনও করলে কল্লা মটকে দেব। এবার মালেকিন যে চেয়ারে বসেছিলেন ওখানে গিয়ে বসুন। একটু পরে মৃণালবাবু এসে আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন। কথা শেষ করে হাসেম চলে গেল।

আজ চার'মাস ফায়সাল এখানে কাজ করছে। এর মধ্যে চৌধুরী স্টেটের সবকিছু দেখেছে, সাজ্জাদের কাছে লাঠিখেলায় পারদর্শী হয়েছে, কয়েকদিন আগে একটা রিভলবারও পেয়েছে। অফিসের কাজ সকাল ন'টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত করে। বিকেলে সাজ্জাদকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে বেরোয়।

সাজ্জাদের বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। লেখাপড়া তেমন জানে না। তার বাবা লেঠেলদের সর্দার ছিল। ছেলে সাজ্জাদকে লাঠিখেলায় দক্ষ করেছে।

সাজ্জাদের বাবাও চৌধুরী বাড়িতে চাকরি করত। বাবা মারা যাওয়ার পর সাজ্জাদকে ইনসান চৌধুরী চাকরি দেন। ফায়সাল কৌশলে সাজ্জাদকে হাত করে চৌধুরী বাড়ির অনেক খবর জেনেছে। ফায়জুন্নেসার মা লুৎফা বেগম বেঁচে আছেন। তার কাছেই জানার পর ওনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু কিভাবে করবে চিন্তা করে ঠিক করতে পারছে না। আরো জেনেছে পাশের গ্রামের আজিজ কয়েক বছর এই স্টেটের ম্যানেজার ছিল। মালেকিন তাকে বরখাস্ত করার পর থেকে সে শত্রুতা করে আসছে। মাঝে মাঝে চৌধুরী স্টেটের জমির ফসল লুট করতে আসে লেঠেল বাহিনী নিয়ে। সে সময় উভয় বাহিনীর সঙ্গে মারামারি হয়। উভয় বাহিনীর অনেকে হতাহত হয়।

ফায়সাল সিদ্ধান্ত নিল যেমন করে হোক শত্রুতার অবসান ঘটাতে হবে। তার আগে এ বাড়ির সবাইকে ধর্মের পথে আনতে হবে। ছ'মাসের মধ্যে মৃণালবাবু ছাড়া অফিসের সব স্টাফকে ও বাড়ির সব চাকর-চাকরানি এমন কি হাসেমকে পর্যন্ত কুরআন-হাদিসের বাণী শুনিয়ে ধর্মের পথে আনতে সক্ষম হল। এখন সবাই তাকে পীরের মতো মানে।

ফায়জুন্নেসা মাঝে মধ্যে যখন মৃণালবাবুর কাছে ফায়সালের কাজ কর্মের খোঁজ নেন তখন মৃণালবাবু ফায়সালের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ওনার আগে এত ভালো ছেলে কেউ ম্যানেজার হয়ে আসে নি।

কুলসুম ফায়জুন্নেসার বিশ্বস্ত চাকরানি। তাকে সব সময় মাথায় কাপড় দিতে দেখে একদিন ফায়জুন্নেসা জিজ্ঞেস করলেন, মাথায় কাপড় দিয়ে থাকিস কেন?

কুলসুম বলল, মেয়েদের মাথায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ইসলামের হুকুম।

অবাক হয়ে ফায়জুন্নেসা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামের হুকুমের কথা তোকে কে বলেছে?

ম্যানেজার সাহেব বলেছেন। শুধু আমাকে নয়, এ বাড়ির সব চাকর-চাকরানিদেরকে ইসলামের কথা বলে সে সব মেনে চালাবার চেষ্টা করছেন।

ঠিক আছে, হাসেমকে আমার কাছে আসতে বল।

একটু পরে হাসেম এসে বলল, ডেকেছেন মালেকিন?

হ্যাঁ, শুনলাম ম্যানেজার নাকি তোদের সবাইকে ধার্মিক বানাবার চেষ্টা করছেন?

আপনি ঠিকই শুনেছেন। এতদিন আমরা ধর্মের কোনো কিছুই জানতামও না মানতামও না। ম্যানেজার সাহেবের কাছে সেসব জেনে আমরা মেনে চলছি। আমার কি মনে হয় জানেন মালেকিন, ম্যানেজার সাহেব আল্লাহর একজন খাস বান্দা। সাজ্জাদের কাছে শুনলাম, কয়েকদিন আগে ম্যানেজার সাহেব পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। সে কথা আজিজ সাহেব জানতে পেরে গুণ্ডা বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিলেন। উনি তাদের সঙ্গে লড়াই করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন। আপনিই বলুন, আল্লাহর খাস বান্দা না হলে কি এটা সম্ভব হত?

ফায়জুন্নেসা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সাজ্জাদ সঙ্গে ছিল না?

না, তবে ওর কোনো দোষ নেই। ও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, ম্যানেজার সাহেব নেন নি।

ম্যানেজারের সাহসতো কম না, একা একা দুশমনের গ্রামে গেছেন? ওনাকে বলে দিবি আর কখনও যেন না যান। আর শোন, আজ সন্ধ্যের পর দোতলার ড্রইংরুমে ওনাকে নিয়ে আসবি। সে কথা এখনই গিয়ে বলবি।

জ্বি বলব বলে হাসেম অনুমতি নিয়ে চলে গেল।

লুৎফা বেগম মেয়ের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে যখন বুঝিয়ে ও বকা-বকি করে তার মতিগতি শুধরাতে পারলেন না তখন থেকে তিনি সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। চৌধুরী স্টেটের ও সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনো খোঁজ খবর রাখেন না। বেশিরভাগ সময় ইবাদত বন্দেগী করে কাটান। একদিন ওনার খাস চাকরানি ফরিদাকে নামায পড়তে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ আজ নামায পড়লি যে? তোকে তো কোনো দিন নামায পড়তে দেখি নি।

ফরিদা বলল, আমাদের নতুন ম্যানেজার শুধু আমাকে নয় এ বাড়ির সবাইকে নামায ধরিয়েছেন।

আরো অবাক হয়ে লুৎফা বেগম বললেন, সবাইকে মানে? তোদের মালেকিনকেও?

মালেকিন তো ম্যানেজার সাহেবের ওয়াজ শোনেন না। শুনলে নিশ্চয় পড়তেন।

ম্যানেজার মৌলবী না কি যে, তোদেরকে ওয়াজ করে।

মনে হয় মৌলবী।

তা কখন তোদের কাছে ওয়াজ করে?

রাত দশটা থেকে এগারটা পর্যন্ত।

অতরাতে কোথায় ওয়াজ করে?

ওনার ঘরে। পুরুষরা ওনার ঘরের মেঝেয় বসে আর আমরা মেয়েরা দরজার সামনে বারান্দায় বসি। জানেন বড় মা, হাসেম মিয়া বলেন, ম্যানেজার সাহেব আল্লাহর খাস বান্দা।

এসব কথা তোদের মালেকিন জানে?

তা বলতে পারব না।

ফরিদার কথা শুনে লুৎফা বেগম ম্যানেজারের উপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে দো'য়া করলেন, "আল্লাহ তুমি ওকে দুশমনদের হাত থেকে হেফাজত করো, ওর দ্বারা ফায়জুন্নেসাকে হেদায়েত করো।" ভেবে রাখলেন, সময় সুযোগ মতো ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করবেন।

মাগরিবের নামাযের পরে হাসেম ফায়সালকে দোতলার ড্রইংরুমে নিয়ে এসে বসতে বলে চলে গেল। ফায়সাল আসবাবপত্র দেখে বুঝতে পারল, এ নিচতলার ড্রইংরুমের থেকে আরো উন্নত। প্রায় দশ মিনিট পর ফায়জুন্নেসাকে ঢুকতে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

ফায়জুন্নেসা সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর বললেন, শুনলাম আপনি নাকি ওয়াজ নসিহত করে সবাইকে হেদায়েত করে ফেলেছেন?

ফায়সাল বলল, হেদায়েত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আমি শুধু আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ)-এর বাণী সবাইকে শুনিয়েছি। আর এটা করা প্রত্যেক জ্ঞানী মুমিন মুসলমানের কর্তব্য। নচেৎ কাল কেয়ামতের ময়দানে জ্ঞানীদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আপনিতো ভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল সাইন্সে মাস্টার্স করেছেন, কুরআন হাদিসের জ্ঞান পেলেন কি করে?

প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। শুধু মাদরাসার ছাত্ররা কুরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করবে আর স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্ররা করবে না, এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। মুসলমান হিসাবে তাদের পাঠ্য বইয়ের পড়ার অবসর সময়ে ধর্মীয় জ্ঞান যেমন অর্জন করতে হবে তেমনি সেই জ্ঞানের অনুশীলনও করতে হবে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমি তাই করেছি বলে সেই জ্ঞান প্রসার করার চেষ্টা করছি। স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছেলেমেয়েরা তা করছে না বলে তারা ধর্মের জ্ঞান যেমন পাচ্ছে না তেমনি অনুশীলনও করছে না। আপনার কথাই ধরুন না, আপনি যদি স্কুল ও কলেজে পড়ার সময় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন ও অনুশীলন করতেন, তা হলে আপনার ও আপনার বাড়ির সবার জীবন ধারা অন্য রকম হত।

ফায়জুন্নেসা বললেন, এসব কথা এখন থাক। যা বলছি শুনুন, কয়েকদিনের মধ্যে একটা জলমহলের মাছ ধরে বিক্রি করা হবে। খবর পেয়েছি আমাদের শত্রুরা মাছ লুট করতে আসবে। আপনি আমাদের বাহিনী নিয়ে তৈরি থাকবেন যেন তারা তা করতে না পারে।

ফায়সাল মৃদু হেসে বলল, আমি সে কথা জানি এবং সেভাবে প্রস্তুতি নিয়েই আছি। ও নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ আমরা সফলতা লাভ করব।

ফায়জুন্নেসা শত্রু পক্ষের খবর জানার জন্য বশির নামে এমন একজনকে নিযুক্ত করেছেন, যার বাড়ি আজিজের গ্রামে এবং সে আজিজের বাড়ির চাকর। বশির তার দশ বার বছরের ছেলে সাগিরের দ্বারা খবরটা পাঠিয়েছে। ম্যানেজার খবর জানে শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানলেন কি করে?

ম্যানেজার হিসাবে স্টেটের শত্রু মিত্রের সব খবর রাখা আমার কর্তব্য নয় কি?

হ্যাঁ কর্তব্য। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

আপনি যেভাবে জেনেছেন।

আরো অবাক হয়ে ফায়জুন্নেসা বললেন, মানে?

মানে আপনার মতো আমারও গুপ্তচর আছে। এরপর আর কোনো প্রশ্ন করবেন না। কারণ উত্তর দিতে পারব না।

ফায়জুন্নেসা একটু রাগের সঙ্গে বললেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনি আমার বেতনভুক্ত একজন কর্মচারী। কর্মচারীর উচিত নয় মালিককে কোনো প্রশ্ন করতে নিষেধ করা।

আপনিও ভুলে যাচ্ছেন কেন, এতবড় স্টেটের ভালো মন্দের দায়িত্ব যার উপর, সে একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী হলেও তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর মালিকের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

ফায়জুন্নেসা রাগ সামলাতে না পেরে কঠিন কণ্ঠে বললেন, আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

মনে হচ্ছে আমার কথায় অপমান বোধ করে খুব রেগে গেছেন। আমি কিন্তু আপনাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য কথাটা বলি নি, বলেছি স্টেটের ভালোর জন্য। প্রত্যেকের জীবনে কিছু না কিছু গোপনীয়তা থাকে। স্বেচ্ছায় না বললে জোর খাটিয়ে জানতে চাওয়া কারো উচিত নয়। আপনি জানেন কি না জানি না, আপনার মেয়ে স্বপ্নার রেজাল্ট বেরিয়েছে, উনি খুব শিগ্গি ফিরে আসছেন। এখন আপনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন, এ কথা আমি জানলাম কি করে? এর উত্তরও আমি দিতে পারব না। এজন্য আমার উপর আপনার অসন্তুষ্ট হওয়া কিংবা জোর করে জানতে চাওয়া উচিত হবে না।

স্বপ্না তিন মাস আগে মাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, তার ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ, রেজাল্ট বেরোবার পর আসবে। চিঠি পড়ে ফায়জুন্নেসা মা লুৎফা বেগমকে কথাটা জানিয়েছিলেন। ওনারা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না, জানা সম্ভবও নয়। এখন ম্যানেজারের মুখে স্বপ্না খুব শিগ্গি ফিরে আসছে শুনে এত অবাক হলেন যে, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।

ফায়সাল মৃদু হেসে বলল, আমার কথা শুনে খুব অবাক হয়েছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করে জানতে পারলাম দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না। ও হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি। আশপাশের কয়েকটা গ্রামের মধ্যে মাদরাসা নেই। যার ফলে ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে পড়লেও ধর্মের জ্ঞান কিছুই পাচ্ছে না। তাই এই গ্রামে একটা মাদরাসা করতে চাই। আপনার অনুমতি পেলে আমি সে ব্যাপারে অগ্রসর হব।

ফায়জুন্নেসার তখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, স্বপ্না বাড়ি আসার কথা ম্যানেজার জানলেন কি করে? তা হলে উনি কি সত্যিই আল্লাহর খাস বান্দা? দাদির মুখে শুনেছেন, যারা আল্লাহর খাস বান্দা, তাদেরকে আল্লাহ আগে ভাগে অনেক কিছু জানিয়ে দেন। যদি তাই হয়, তা হলে ম্যানেজার কি আমার সম্পর্কে সবকিছু জানেন? গভীরভাবে এইসব চিন্তা করছিলেন বলে ফায়সালের মাদরাসা করার কথা শুনতে পেলেন না।

ওনাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফায়সাল বলল, আমার কথার উত্তর দেবেন না?

লুৎফা বেগম ফরিদার মুখে দোতলার ড্রইংরুমে ম্যানেজারের সঙ্গে ফায়জুন্নেসা আলাপ করছে শুনে তাকে দেখার জন্য এসে এতক্ষণ পর্দার আড়াল থেকে তাদের আলাপ শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে পর্দা ফাঁক করে ম্যানেজারকে দেখছিলেন। উনি দোতলার বারান্দা থেকে বাড়ির সামনের ক্ষেতে লোকজনদের তদারকী করতে তাকে কয়েকবার দেখেছেন। কাছ থেকে দেখে ওনার অন্তর

জুড়িয়ে গেছে। এত সুন্দর ছেলে এর আগে কখনও দেখেন নি। তার কথা বার্তা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। স্বপ্নার খুব শিগ্গি ফেরার কথা শুনে তিনিও খুব অবাক হয়েছেন। শেষে মাদরাসার কথা শুনে খুব খুশি হলেন। মেয়ে কিছু বলছে না দেখে ভিতরে ঢুকে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ম্যানেজারের কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

মায়ের কথায় ফায়জুন্নেসা সম্বিত ফিরে পেয়ে ফায়সালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি জিজ্ঞেস করেছেন?

ফায়সাল মাদরাসা করার ব্যাপারে যা বলেছিল, আবার বলল।

ফায়জুন্নেসা বললেন, এ ব্যাপারে পরে আলাপ করব। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবে?

লুৎফা বেগম বললেন, হ্যাঁ।

তা হলে আমি এখন যাই বলে ফায়জুন্নেসা চলে গেলেন।

ওনাদের কথা বার্তায় ফায়সাল যদিও বুঝতে পারল, ইনি ফায়জুন্নেসার মা, তবু বলল, আপনার পরিচয় জানতে পারলে খুশি হতাম।

আমি লুৎফা বেগম, ফায়জুন্নেসার মা।

ফায়সাল প্রথমে দাঁড়িয়ে সালাম দিল, তারপর এগিয়ে এসে কদমবুসি করে বলল, বসুন।

লুৎফা বেগম বসার পর ফায়সাল বসে বলল, আপনাকে দেখার ও আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা অনেক দিনের। আজ আল্লাহ সেই ইচ্ছা পূরণ করে ধন্য করলেন, সেজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি।

তার আচরণে লুৎফা বেগম আরো মুগ্ধ হলেন। বললেন, আপনার কথা চাকর-চাকরানিদের কাছে শুনে আমারও আপনাকে দেখার অনেক দিনের ইচ্ছা। ফায়জুন্নেসার সঙ্গে আপনার আলাপ দরজার বাইরে থেকে শুনেছি। তারপর ভিতরে ঢুকে আপনার আচরণ দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এখানে চাকরি করতে যে বায়ডাটা দিয়েছেন, তা সত্য নয়। আসল পরিচয় বললে আমিও আপনার মতো খুশি হতাম।

ফায়সাল বুঝতে পারল, ইনি শুধু উচ্চশিক্ষিতা নন, বুদ্ধিমতীও। বলল, আপনাকে আমি খুশি করার চেষ্টা করব। তার আগে আমার একান্ত অনুরোধ আমাকে আপনি করে বলবেন না, তুমি করে বলবেন। আফটার অল আমি তো আপনার নাতির বয়সী।

ঠিক আছে, তাই বলব। এবার তোমার আসল পরিচয়টা বল।

আসল পরিচয় এখন কিছুতেই বলা সম্ভব নয়, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। তবে আল্লাহ রাজি থাকলে কিছুদিনের মধ্যে সবাই জানতে পারবেন।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে। এখানে চাকরি করতে আসা তোমার আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্যটা কি বলতো ভাই?

দুঃখিত তাও বলা সম্ভব নয়। সে জন্য আবার ক্ষমা চাইছি।

আমার অনুমান সত্য না মিথ্যে, এতটুকু অন্তত বল।

সত্য।

লুৎফা বেগমের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। বললেন, শুনেছি, তুমি নাকি অনেক কিছু জান, চৌধুরী বংশের পূর্ব ইতিহাসও জান?

দয়া করে আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, কারণ আমার পক্ষে উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

লুৎফা বেগম রেগে উঠে বললেন, তোমার সাহস তো কম না, কার কথা অগ্রাহ্য করছ জান?

জি, জানি। মরহুম ইনসান চৌধুরীর বেগম আপনি। ইচ্ছা করলে আমাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারেন। আর এটাও জানি, আমার উপর যতই রেগে যান না কেন, এই মুহূর্তে কঠিন শাস্তি কেন, লঘু শাস্তিও দেবেন না।

কি করে বুঝলে?

আপনি বিচক্ষণ মহিলা, আপনার ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও প্রখর। রাগের অভিনয় করে আমাকে ভয় দেখিয়ে আমার না বলা কথাগুলো জানতে চাচ্ছেন।

ম্যানেজারের কথা শুনে লুৎফা বেগম এত অবাক হলেন যে, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। কারণ তিনি তাই-ই চেয়েছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, সত্যি করে বলতো তুমি মানুষ না অন্য কিছু?

নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না বলে ফায়সাল লুৎফা বেগমের পায়ে হাত রেখে বলল, আমি যে মানুষ এবার বিশ্বাস হল তো?

ঠিক আছে, উঠে বস।

ফায়সাল বসল না, দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এবার যাওয়ার অনুমতি দিন।

আর একটু বস, দু'একটা কথা বলব।

ফায়সাল বসার পর বললেন, জেনেছি তুমি এ বাড়ির সবাইকে কুরআন হাদিসের বাণী শুনিয়ে ধর্মের পথে এনেছ; কিন্তু তোমার মালেকিনের জন্য কিছু কর নি কেন? না তাকে খুব ভয় পাও?

মুমিনরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। মালেকিনের ব্যাপারে একেবারেই যে কিছু করি নি তা নয়। যতটুকু করেছি তার ফলাফল কিছু দিনের মধ্যে দেখতে পাবেন।

শুনে খুশি হলাম বলে লুৎফা বেগম বললেন, এবার তুমি এস।

আজ তিন দিন আজিজের গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের বাড়িতে সাদা চুল দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ মুসাফির রয়েছেন। উনি দিন রাতের মধ্যে বেশিরভাগ সময় মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করেন। দিনে রোযা থাকেন। ইমাম সাহেব মসজিদেই ইফতার পাঠান। এশার নামাযের পর ইমাম সাহেবের সঙ্গে ওনার বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আবার মসজিদে চলে আসেন। ইমাম সাহেব এই গ্রামেরই লোক। বয়স প্রায় সত্তরের কাছা-কাছি। উনি কুরআনের হাফেজ ও পরহেজগার। ইমামতি করে কোনো টাকা পয়সা নেন না।

ইমাম সাহেব একদিন জোহরের নামাযের পর একজন সুফি ধরনের বৃদ্ধ লোককে মসজিদে বসে তসবিহ পড়তে দেখে সালাম বিনিময় করে পরিচয় জানতে চাইলেন। তখনও যে সব মুসুল্লি মসজিদে ছিল, তারা ইমাম সাহেবকে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে কাছে এস বসল।

লোকটি বললেন, আমি মুসাফির মানুষ। আমার নিজস্ব কোনো বাড়ি ঘর নেই। দেশ ভ্রমণ করা ও আল্লাহর ইবাদত করাই আমার একমাত্র কাজ।

মুসাফিরকে ইমাম সাহেবের খুব ভালো লাগল, বললেন, আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন, খাওয়া-দাওয়া করবেন।

মুসাফির ইমাম সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চস্বরে বললেন, রোযা আছি।

কথাটা শুনে ওনার উপর ইমাম সাহেবের ভক্তি বেড়ে গেল। উনিও মুসাফিরের কানে কানে বললেন, তা হলে আমার বাড়িতে ইফতার করবেন, রাতে খানাও খাবেন।

একইভাবে মুসাফির বললেন, আমি কারো বাড়িতে খাই না। তবে আপনাকে পরহেজগার মনে হচ্ছে, তাই আপনার বাড়িতে খাব। কিন্তু যে কয়েকদিন এখানে থাকব, বাজার অনুপাতে আপনাকে টাকা নিতে হবে।

ইমাম সাহেবও একইভাবে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) মুসাফিরের খিদমত করতে বলেছেন। আমি তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনার সব রকমের খিদমত করতে চাই। আর আপনি তা থেকে বঞ্চিত করার জন্য বখিলের পরিচয় দিচ্ছেন।

মুসাফির আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

ইমাম সাহেব লোকজনদের নিয়ে মসজিদের বাইরে এসে বললেন, তোমরা ওনার সঙ্গে বেয়াদবের মতো কথাবার্তা বলো না। উনি সুফি মানুষ, দেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন।

একজন মুসুল্লি জিজ্ঞেস করল, আপনারা কানে কানে কি কথা বললেন?

দু'জনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে, ইমাম সাহেব সেসব বলে বললেন, উনি যে অলি-আল্লাহ ধরনের লোক, তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?

মুসুল্লিরা তা স্বীকার করে যে যার পথে চলে গেল। দু'তিন দিনের মধ্যে মুসাফিরের কথা গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল।

আজিজের বাড়ি থেকে মসজিদ বেশ খানিকটা দূরে। তাই কিছু দিন থেকে নামায পড়তে শুরু করলেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে পড়েন। তবে জুম্মা পড়তে মসজিদে যান। এক কান দু'কান করে ওনারও কানে কথাটা পড়েছে। ভেবেছেন, জুম্মা পড়তে গিয়ে মুসাফিরের সঙ্গে আলাপ করবেন এবং রাতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেবেন।

আজ জুম্মাবার। অন্যান্য দিনের চেয়ে নিয়মিত মুসুল্লি ছাড়াও অনেকে এসেছে মুসাফিরকে এক নজর দেখার জন্য। আজিজ ও তার ছেলেও এসেছেন।

প্রতি জুম্মাবারে আযানের পর ইমাম সাহেব কিছুক্ষণ ওয়াজ করেন। আজ ওয়াজ করার শেষে বললেন, মুসাফির হয়তো দু'একদিনের মধ্যে চলে যাবেন। তাই নামাযের পর আপনাদেরকে কিছু বলবেন। সবাই থাকবেন।

নামাযের পর মুসাফির দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাম দিলেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও রসুল (দঃ)-এর উপর কয়েক মর্তবা দরুদ পাঠ করে বললেন, আমি আল্লাহর এক নাদান বান্দা। আল্লাহ মেহেরবাণী করে আমাকে কিছু এলেম হাসিল করিয়েছেন। আল্লাহ কালামপাকে কলেমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত যেমন ফরজ করেছেন, তেমনি যারা দ্বীনি এলেম হাসিল করেছেন তাদের উপরও ফরয করেছেন, সেই দ্বীনি এলেম মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার। সেই ফরয আদায়ের জন্য আমি যেখানেই যাই সেখানেই মানুষকে ধর্মের কথা জানিয়ে অসৎ কাজ করতে নিষেধ করি ও সৎ কাজ করার কথা বলি।

আজকাল মাওলানা, হাফেজ ও সাধারণ লোকেরা সুন্নতি পোশাক হিসাবে লম্বা পীরান পরেন যার ঝুল টাখনুর উপরে পড়ে। এমন কি টাখনুর নিচেও চলে যায়। এতে সুন্নত আদায় হয় না, বরং কঠিন গুনাহ হয়। কারণ পাজামা, লুঙ্গি ও পিরানের ঝুল পায়ের গোচ পর্যন্ত থাকা সুন্নত। আর টাখনুর উপর (টাখনু যেন দেখা যায়) পর্যন্ত পাজামা, লুঙ্গি ও পিরানের ঝুল থাকলে জায়েজ হবে। যে কোনো পোশাক টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরলে মানুষের মনে অহঙ্কার জন্মায়। অহঙ্কার মুসলমানদের জন্য হারাম। হাদিসে আছে, আমাদের নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "পায়ের গোড়ালীর নিম্নে পায়জামার যে অংশ ঝুলিতে থাকে, উহা দোযখের অগ্নিতে অবস্থিত।"[১]

---

(১) বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) - বুখারী।

এখন কেউ যদি বলেন, আমি অহঙ্কার বশত গোড়ালীর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরি না, তবে তাকে বলব, গোড়ালীর উপরে কাপড়ের ঝুল রেখে পরে দেখুন আপনার মনের অবস্থা কি হয়। অনেক ইমাম সাহেব জামাতে নামায পড়ার সময় ইক্বামতের আগে মুসুল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সবাই গোড়ালীর উপর কাপড়ের ঝুল তুলে নেন। মুসুল্লীরা তাই করে থাকেন। ফলে মুসুল্লীরা মনে করেন, শুধু নামায পড়ার সময় গোড়ালীর উপর কাপড়ের ঝুল থাকা দরকার, অন্য সময় দরকার নেই। তাই নামায শেষ করে তারা কাপড়ের ঝুল গোড়ালীর নিচে আবার ঝুলিয়ে দেন।

আসলে ইমাম সাহেবরা যদি অন্য সময়ে হাদিসের বাণী শুনিয়ে সব সময় গোড়ালীর উপর কাপড়ের ঝুল রেখে পরতে বলতেন, তা হলে হয়তো মুসুল্লীদের ভুল ধারণা হত না।

আর একটা কাজ মুসুল্লীরা করে থাকেন, তা হল নামায পড়ার জন্য মসজিদে এসে সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও নিজের সুবিধেমতো জায়গায়, অর্থাৎ জানালার ধারে অথবা ফ্যানের নিচে নামায পড়তে শুরু করে দেন অথবা বসে থাকেন। ফলে পরে যারা আসেন তারা তাদের গায়ের উপর থেকে সামনের কাতারে যান। এরকম করা মোটেই উচিত নয়। এ সর্ম্পকে দু'টো হাদিস বলছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "প্রথম সারিকে প্রথম পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহার সংলগ্ন পিছনের সারিকে। যাহা কম থাকে তাহা যেন সর্বশেষ সারিতে থাকে।"[১]

একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "লোক সর্বদা প্রথম সারি হইতে পিছনে থাকিতে চাহিবে, ফলে আল্লাহও তাহাদিগকে পিছাইতে পিছাইতে দোযখ পর্যন্ত পিছাইয়া দিবেন।"[২]

জামাতে নামায পড়ার সময় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হবে, ফাঁক রেখে দাঁড়ান নিষেধ। হাদিসে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা সারি সমূহে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া দাঁড়াইবে এবং উহাদিগকে (অপর নামাযীদিগকে) নিকটে নিকটে রাখিবে। তোমাদের ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখিবে। সেই আল্লাহর শপথ, যাহার হাতে আমার জীবন রহিয়াছে। নিশ্চয় আমি শয়তানকে দেখি, সে সারির ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে যেন কালো ভেড়ার বাচ্চা।"[৩]

অনেকে জেনে না জেনে গরমের জন্য হোক অথবা অহঙ্কার বশত হোক গায়ে গা না ঠেকিয়ে ফাঁক রেখে দাঁড়ান, এটা উক্ত হাদিস মোতাবেক একেবারেই উচিত নয়।

(১) বর্ণনায় : হযরত আনাস (রাঃ) -আবুদাউদ।
(২) বর্ণনায় : হযরত আয়েশা (রাঃ) - আবু দাউদ।
(৩) বর্ণনায় : হযরত আনাস (রাঃ) - আবু দাউদ।

এবার অন্য কথায় আসি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে খ্রিস্টানরা মিশনারী খুলে হাসপাতাল ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিনা পয়সায় গরিবদের চিকিৎসা করাচ্ছে, গরিব ছেলেমেয়েদের বই পুস্তক দিয়ে এমন কি একবেলা খাইয়ে স্কুলে লেখাপড়া করাচ্ছে। আবার অনেক দুঃস্থ মহিলা ও পুরুষকে আর্থিক সাহায্য করছে। তাদের অনেকের চাকরি দিচ্ছে। তারপর অতি কৌশলে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান করছে। আর মুসলমানরা ভাইয়ে ভাইয়ে জমি জায়গা নিয়ে ঝগড়া মারামারি দলাদলি ও মামলা করে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানরা লোভ, হিংসা ও অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যে, করছে না। খ্রিস্টানরা যে কাজ করছে, সেই কাজ মুসলমানদের করতে হবে এবং করা একান্ত উচিত।

যাদের স্বচ্ছল অবস্থা তারা সম্মিলিতভাবে এসব কাজ করে প্রতিটি ঘরে ইসলামের জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারীদের মোকাবেলা করতে হবে। তা না করে যদি শুধু দুনিয়াতে গরিবদের রক্ত শুষে কি করে আরো বড়লোক হবেন, কি করে গরিবদের উপর মাতবরী করবেন, কি করে নিজের শান শওকাত বাড়াবেন, এসব কাজে ব্যস্ত থাকেন, তা হলে কাল হাশরের মাঠে আল্লাহর কাছে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে আর দুনিয়াতেও তার ফল ভোগ করতে হবে।

একদিন মুসলমানরা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করে ও সেসব অনুসরণ-অনুশীলন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে ও সভ্যতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। আর বর্তমানে মুসলমানরা কুরআন-হাদিসের বাণী ত্যাগ করে ইহুদী-খ্রিস্টানদের পদলেহন করে আত্মতৃপ্ত করছে। ফলে সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের উপর আল্লাহর গযব নিপতীত হয়েছে। যাদের পদলেহন করে আত্মতৃপ্ত করছে, সেই ইহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসকদের উপর প্রভুত্ব করছে? এক মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধিয়ে মুসলমানদের শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, মুসলমানদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। তবু মুসলমানদের হুঁশ হচ্ছে না, তাদেরকেই প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে নিজেরা দাসে পরিণত হয়েছে শুধু নিজেদের গদি রক্ষার জন্য।

যাই হোক, মুসলমানদের অবক্ষয়ের কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। আপনারা অনেকে না খেয়ে নামায পড়তে এসেছেন। আপনাদের আর কষ্ট দেব না। শেষে আর একটা কথা বলে ইতি টানব, আমাদের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, দলা-দলি ও লোভ-লালসা দূর করে একে অন্যের বিপদে সাহায্য করতে হবে। ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাতব্বরদের ন্যায় বিচার করতে হবে। যদিও অপরাধী বাপ, ভাই বা ছেলে হোক

না কেন। মনে রাখবেন প্রতিটি কাজের জন্য, সবাইকে হাশরের মাঠে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই প্রতিটি মুমীন মুসলমানকে মউত, কবর, হাশর ও জাহান্নামের কথা চিন্তা করে দুনিয়াদারী করতে হবে। এসব কাজে মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে অগ্রভূমিকা নিতে হবে। যদি ওনারা মনে করেন, বেতন নিয়ে শুধু নামায পড়াবেন আর মিলাদ পড়িয়ে ইনকাম করে সুখে দিন কাটাবেন, স্বাধীনভাবে দ্বীনের হক কথা বললে মসজিদ কমিটি ছাঁটাই করে অন্য ইমাম রাখবেন, তা হলে বিরাট ভুল করবেন। কারণ এরকম মনে করলে আপনি আল্লাহর গোলাম না হয়ে মসজিদ কমিটির গোলাম হয়ে গেলেন।

প্রায় দেখা যায় প্রতিটি মসজিদের কমিটির সদস্যগণের দ্বীনি এলেম নেই। তাই ওনারা কমজোর ঈমানওয়ালা ইমাম সাহেবদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছেন। ঐসব ইমাম সাহেবরা স্বাধীনভাবে দ্বীনের কথা বলতে পারেন না চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে। সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল, তারা আল্লাহর গোলামী না করে দুনিয়াদারী হাসিলের জন্য শয়তানের গোলামী করছে। মনে রাখবেন, যারা আল্লাহর গোলামী পরিত্যাগ করে শয়তানের গোলামী করবে, কিছু দিনের জন্য তারা সুখ ভোগ করলেও অচিরে তাদের উপর দুনিয়াতে যেমন আল্লাহ নানারকম বিপদ আপদ ও গযব নাজিল করবেন, তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে জাহান্নামে দাখেল করবেন। সবশেষে মুরুব্বীদের ও যারা ছেলেমেয়ের বাবা, তাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, আপনারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে সেইমতো নিজেকে ও পরিবারের সবাইকে চালিত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনকে বোঝার ও সেই মতো চলার তওফিক দান করুন, আমিন। এবার আপনারা আসুন।

মুসাফিরের ওয়াজ আজিজের মনে রেখাপাত করল। সবাই চলে যাওয়ার পর বললেন, আজ রাতে আমার বাড়িতে খাবেন আর যে কয়েকদিন এখানে থাকবেন, আমার বাড়িতেই থাকবেন। আপনার কাছ থেকে আরো মূল্যবান কথা শুনব।

মুসাফির বললেন, মাফ করবেন, আমি কারো বাড়িতে খাই না। অপারগ অবস্থায় খেলেও টাকা দিয়ে খাই। আপনি এই গ্রামের মানি, গুণী ও গণ্যমান্য লোক। খাওয়ার জন্য টাকা দিলে আপনাকে অপমান করা হবে। কাল ফজরের নামায পড়ে এখান থেকে চলে যাব। তাই আজ এশার নামাযের পর আপনার বাড়িতে যাব। কিন্তু একথা কাউকে জানাবেন না। তবে আপনার পরিবারের সবাইকে জানাতে পারেন। ওনারা যেন রুমের বাইরে থেকে আমার কথা শুনতে পান, সে ব্যবস্থা করবেন। আবার বলছি, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন না। আমি খাওয়া-দাওয়া করেই যাব।

আজিজ বললেন, খাওয়া-দাওয়া না করলেও আপনি যাবেন শুনে খুব খুশি হয়েছি। তারপর মোসাফাহা ও সালাম বিনিময় করে চলে গেলেন।

মুসাফির যখন আজিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল তখন রাত প্রায় দশটা। আজিজ বৈঠকখানায় ওনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দরজার কাছে এসে সালাম দিতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সালামের উত্তর দিলেন। তারপর সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এসে বসালেন। আজিজ ঘরের সবাইকে বলে দিয়েছিলেন, মুসাফির আসার পর তোমরা বৈঠকখানার দরজা জানালার কাছে থেকে ওনার কথা শুনবে। ওনার আসার খবর পেয়ে সবাই বৈঠকখানার বাইরে এসে জমা হল।

মুসাফির বললেন, আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। কয়েকটা কথা বলছি শুনুন, মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও সুখ শান্তি কামনা করে। কিন্তু সবাই কি তা পায়? পায় না। ততটুকু পায়, যতটুকু আল্লাহ তার তক্বদিরে লিখে রেখেছেন। তাই যার যতটুকু আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। হাদিসে আছে, "অল্পে সন্তুষ্টি বৃহৎ সম্পত্তির মালিক।" তাই বলে বড় হবার চেষ্টা করবে না, তা নয়। তবে সেই চেষ্টা সৎ পথে হতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা বড় হতে চায়, তারা সৎ-অসৎ বিচার না করে অবৈধ পথে উপার্জন করছে। অথচ অবৈধ পথে উপার্জন করা হারাম। আপনার বিষয়-সম্পদ অনেক, এসব যদি সৎ পথের উপার্জনে হয়, তা হলে খুবই ভালো, আর যদি অসৎ পথে হয়ে থাকে, তা হলে খুবই খারাপ। বেশিরভাগ মানুষ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যেমন অন্যায় পথে রুজী-রোজগার করে, তেমনি এমন অনেক গর্হিত কাজও করে, যেগুলো আল্লাহ হারাম করেছেন। আর যারা হারাম পথে রুজী-রোজগার করেন তাদের কোনো ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। তাই সবাইয়ের উচিত সব রকমের অন্যায় পরিত্যাগ করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর ও তাঁর রসুল (দঃ) এর বিধান মেনে চলা। মনে রাখবেন, শুধু ধন-সম্পদের মালিক হলেই মান-সম্মান ও সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। সবকিছু পাওয়া না পাওয়া আল্লাহপাকের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে ধনীকে গরিব ও গরিবকে ধনী করে দিতে পারেন। আল্লাহ কুরআনপাকে বলিয়াছেন, "আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রেযেক্ব দান করেন এবং (যাহাকে ইচ্ছা) সংকীর্ণ করিয়া দেন; আর ইহারা পার্থিব জীবনের উপার্জন করে, অথচ এই পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ সামগ্রী ভিন্ন কিছুই নহে।"[১] যাই হোক, এবার আপনাকে অনুরোধ করব, খোকসাবাড়ির চৌধুরীদের সঙ্গে আপনাদের যে বিরোধ অনেক দিন থেকে চলে আসছে, তা মিটিয়ে ফেলুন। নচেৎ আপনি বেঁচে থাকতে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, মারা যাওয়ার পর আপনার বংশধররা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু তাই নয়, আখেরাতে কি হবে তা আল্লাহ ভালো জানেন।

(১) সূরা রায়াদ, আয়াত-২৬, পারা-১৩।

এতক্ষণ মুসাফিরের কথা শুনে খুশি হলেও শেষের কথা শুনে আজিজের মনে যেমন সন্দেহ হল, তেমনি রেগে গেলেন। রাগের সঙ্গে বললেন, কে আপনি? চৌধুরী বংশের সঙ্গে আমাদের বিরোধের কথা জানলেন কি করে?

মুসাফির মৃদু হেসে বললেন, রাগ করছেন কেন? আমি আল্লার এক নাদান বান্দা। পথভ্রষ্ট মানুষকে পথে ফিরিয়ে আনা আমার কাজ। শুনুন, শুধু চৌধুরী বংশের বিরোধের কথা নয়, বিরোধের উৎপত্তি ও তার পরের সমস্ত ঘটনা, এমন কি ইনসান চৌধুরীর মেয়ে কেন স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং ওনার স্বামীর মৃত্যু রহস্যও আমি জানি। আরও জানি আপনি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হয়েও এত সয়-সম্পদের মালিক হলেন কি করে? আরো জানি, চৌধুরী বংশের প্রথম পুরুষের আদিবাস ছিল ডোমারে। জিনেদের একঘড়া সোনার মোহর পেয়ে খোকসাবাড়ি এসে বসবাস শুরু করেন। সেই জিনেরা চৌধুরী বংশের পরপর তিন পুরুষকে মেরে একই জলমহলে ফেলে রেখেছিল। আমার কথা শুনে যদি মনে করেন, আমি চৌধুরী বংশের লোক অথবা তাদের হয়ে ওকালতি করতে এসেছি, তা হলে ভুল করবেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনার তো গুণ্ডা বাহিনী আছে, তাদের দিয়ে এই বুড়োকে মেরে সেই জলমহলে ফেলে দেবেন। তা হলে সবাই মনে করবে, জিনেরা মুসাফিরকেও মেরে ফেলে রেখেছে। পুলিশ কেসও আর হবে না। মুসাফিরের কথা শুনে রাগ পড়ে গিয়ে আজিজের মনে ভয় ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না।

মুসাফির ওনার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, আর দেরি করতে পারছি না, এবার আসি বলে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, যাওয়ার সময় একটা কথা বলে যাই, বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার। কয়েকদিনের মধ্যে চৌধুরীরা যে জলমহলে মাছ ধরবে, সেখানে আপনার গুণ্ডা বাহিনী পাঠাবেন না। পাঠালে গুণ্ডারা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে কি না সন্দেহ। আর একটা কথা, যদি আমার প্রতি আপনার সামন্যতম বিশ্বাস থাকে, তা হলে অতি সত্বর চৌধুরীদের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। উনি মানুষ হলেও ওনার চরিত্র ফেরেস্তার মতো। শুনেছেন কিনা জানি না, উনি ম্যানেজার হয়ে আসার পর চৌধুরী বাড়ির আবহাওয়া পাল্টে গেছে। উনি বাড়ির চাকর-চাকরানি থেকে সবাইকেই দ্বীনের পথে এনেছেন। ইনসান চৌধুরীর ডাকসাইটের মেয়ে ফায়জুন্নেসা পর্যন্ত ম্যানেজারের কাছে নত হয়েছেন। উনিও চান আপনাদের সঙ্গে চৌধুরী বংশের মিটমাট হয়ে যাক। আর একটা কথা, মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর এ বছরই হজ্ব করে আসুন। আর যা কিছু গর্হিত কাজ করেছেন, সেজন্যে তওবা করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মাফ চাইবেন। কথা শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

আজিজের মনে তখন ভয়ের ঝড় বইছে। ওনার মনে হল, মুসাফির মানুষ নয়, অন্য কিছু। তা না হলে তার ও চৌধুরী বংশের সবকিছু জানলেন কি করে? এই সব চিন্তা করে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

আজিজের স্ত্রী জাহেদা স্বামীর সব ক্রিয়াকলাপ জানেন। প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু আজিজ রেগে গিয়ে ভীষণ মারধর করতেন। তাই জাহেদা পরে আর প্রতিবাদ করেন নি। আজ বৈঠকখানার বাইরে থেকে মুসাফিরের কথা শুনে তিনিও খুব ভয় পেয়েছেন। মুসাফির চলে যাওয়ার পর ভিতরে এসে স্বামীর ভয়ার্ত মুখ ও তাকে কাঁপতে দেখে সাহস দেয়ার জন্য বললেন, মনে হয়, মুসাফির মানুষ নয়, চৌধুরী বংশের উপর যে জিনের আক্রোশ সেই জিন। উনি আমাদের ভালো চান, তাই এইসব কথা বলে সাবধান করে গেলেন।

জাহেদার সাথে ছেলে মহসীন ও বৌ আমেনাও এসেছে। খোকসাবাড়ির চৌধুরীদের সঙ্গে শত্রুতার কথা মহসীন জানে। কিন্তু শত্রুতার কারণ জানে না। একদিন বাবাকে সে কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আজিজ বলেছিলেন, ওসব তোর জানার দরকার নেই। আজ মুসাফিরের কথা শুনে শত্রুতার কারণ অল্প কিছু আন্দাজ করতে পারল। তার মনে হল, চৌধুরীরা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে না, বরং বাবাই তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছে। মা থেমে যেতে বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে বাবা। মুসাফির যা কিছু করতে বলে গেলেন, তাই করলে হত না?

আজিজ ছেলে বৌকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এখান থেকে যাও। তারা চলে যাওয়ার পর স্ত্রীকে বললেন, আমাকে ধরে ঘরে নিয়ে চল, খুব দুর্বল লাগছে, দাঁড়াতে পারছি না।

যে রাতে ফায়জুন্নেসা ও লুৎফা বেগমের সাথে ফায়সালের আলাপ হয়, তার পরের দিন সকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। চৌধুরী বাড়ির চাকর-চাকরানি থেকে ফায়জুন্নেসা ও লুৎফা বেগম পর্যন্ত খুবই উদ্বিগ্ন। ফায়জুন্নেসা গুণ্ডাবাহিনীকে ফায়সালের খোঁজ করতে বললেন। তারা আশপাশের কয়েকটা গ্রামে খোঁজ করেও পেল না। দু'তিন দিন খোঁজ না পেয়ে ফায়জুন্নেসা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, তা হলে কি আজিজের গুণ্ডারা তাকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে।

লুৎফা বেগম মেয়েকে বললেন, অত ভালো ছেলে আমি জীবনে দেখি নি।

ফায়জুন্নেসা বললেন, আমিও দেখি নি।

আমার কি মনে হয় জানিস, আজিজের গুণ্ডারা তাকে খুন করেছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে, তবে বিশ্বাস করতে পারছি না। ম্যানেজার মারামারিতে সব বিষয়ে পারদর্শী, নিজেকে রক্ষা করার কলা কৌশলেও পারদর্শী। আজিজের গুণ্ডারা তার সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। নিশ্চয় বিশেষ কোনো কাজে কোথাও গেছেন।

তাও হতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমাদেরকে জানিয়ে যাবে না?

হাশেমকে জিজ্ঞেস করেছিস?

করেছি, সেও কিছু জানে না।

পরশু জলমহলে মাছ ধরা হবে, আজিজের গুণ্ডাবাহিনী নিশ্চয় মাছ লুট করতে আসবে। এদিকে ম্যানেজারের কোনো খোঁজ নেই। কি হবে না হবে চিন্তা করেছিস?

ভাবছি, কালকের মধ্যে ম্যানেজারের খোঁজ না পাওয়া গেলে মাছধরা বন্ধ থাকবে।

হ্যাঁ, সেটাই ভলো হবে। আগে ম্যানেজারকে খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা, ও কোনো বিশেষ কারণে ঢাকা যায় নি তো?

তা কি করে হয়? যে কারণেই যান না কেন, বলে নিশ্চয় যেতেন।

লুৎফা বেগম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, ওর মতো ছেলের তাই তো করা উচিত, কিন্তু হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাবে ভাবতেই পারছি না।

ফায়জুন্নেসা বললেন, ভাবছি কাল ঢাকায় ওর বাড়িতে খোঁজ নিতে লোক পাঠাব।

সেটাই ঠিক হবে বলে লুৎফা বেগম মেয়ের কাছ থেকে চলে গেলেন।

পরের দিন ভোরে ফজরের নামায পড়ে লুৎফা বেগম কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় ওনার খাস চাকরানি ফরিদা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, ম্যানেজার সাহেব এসেছেন।

শোকর আল হামদুলিল্লাহ বলে লুৎফা বেগম জিজ্ঞেস করলেন, তুই জানলি কি করে?

ফরিদা বলল, হাশেম মিয়া আপনাকে জানাবার জন্য বলল।

তুই গিয়ে হাশেমকে বল, ম্যানেজারকে উপরের বসার ঘরে নিয়ে আসতে।

হাশেম ম্যানেজারকে লুৎফা বেগমের কথা বলে উপরের বসার ঘরে এনে বসতে বলে চলে গেল।

একটু পরে লুৎফা বেগম এলেন।

ফায়সাল সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

লুৎফা বেগম বললেন, তুমি আর ভালো থাকতে দিলে কই? তা কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলে? এদিকে আমরা তোমার চিন্তায় অস্থির।

ফায়জুন্নেসা লোকজন দিয়ে কত খোঁজ করাল। আজ যদি না আসতে, কাল ঢাকায় তোমাদের বাড়িতে লোক পাঠাত।

স্টেটের একটা বিশেষ কাজের জন্য হঠাৎ আমাকে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল। জানিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানাই নি। সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

কি এমন বিশেষ কাজে গিয়েছিলে?

পরে বলব, এখন বলতে পারছি না বলে আবার ক্ষমা চাইছি।

তুমি তো ফায়জুন্নেসাকে চেনো, আমি ক্ষমা করলেও সে কি করবে?

আল্লাহ আমাকে ক্ষমা আদায় করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

তুমি কি খুব ক্লান্ত?

কেন বলুন তো?

কিছুক্ষণ আলাপ করতে চাই।

না, আমি ক্লান্ত নই। কি আলাপ করতে চান করুন।

তুমি কি চৌধুরী বংশের পূর্ব ইতিহাস জান?

জি, জানি।

কি জান বলতো।

ফায়সাল সবকিছু বলার পর লুৎফা বেগম অবাক কণ্ঠে বললেন, এসব জানলে কি করে?

মাফ করবেন বলতে পারব না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমি চেষ্টা করে জেনেছি।

জিন ও সোনার মহরের কথা বিশ্বাস কর?

জি, করি।

জিনেরা চৌধুরী বংশের পরপর তিন পুরুষ ও জামাই হারেসকে মেরে তাদেরকে একই জলমহলে ফেলে রেখেছিল, বিশ্বাস কর?

জি, করি।

তোমার কি ধারণা, জিনেরা চৌধুরী বংশের সন্তান হিসাবে প্রথমে ফায়জুন্নেসাকে ও পরে তার মেয়ে জেবুন্নেসাকেও মেরে ঐ একই জলমহলে লাশ ফেলে রাখবে?

জি, আমারও তাই-ই ধারণা। তবে জিনেরা এখন আর তা করবে না।

লুৎফা বেগম খুব অবাক হয়ে ফায়সালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তা করবে না বলতে পার?

পারি, তবে আপনাকে ওয়াদা করতে হবে শোনার পর আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না আর কাউকে এসব কথা বলবেন না।

লুৎফা বেগম আরো কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, বেশ ওয়াদা করলাম।

ফায়সাল বলল, চৌধুরী বংশের প্রথম পুরুষ জয়নুদ্দিন সোনার মোহর ভর্তি ঘড়া নিয়ে এখানে চলে আসার পর জিনেরা ওনাকে স্বপ্নে কিছু কাজ করতে বলেছিল। সেসব কাজ করলে ঘড়ার অর্ধেক সোনার মোহর খরচ হয়ে যাবে। তাই তিনি তা করেন নি। তাই জিনেরা ওনাকে মেরে জলমহলে ফেলে রাখে। তারপর ওনার বংশধর আবসার উদ্দিন ও ইনসান চৌধুরীকেও স্বপ্নে জিনেরা সেই কাজ করতে বলে। কিন্তু ওনারাও খরচের ভয়ে করেন নি। তাই ওনাদেরকেও জিনেরা মেরে একই জলমহলে ফেলে রাখে। তারপর ফায়জুন্নেসাকেও জিনেরা একই স্বপ্ন দেখায়। তিনিও স্বপ্নকে স্বপ্ন মনে করে তা করেন নি বরং পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। জিনেরা ওনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো কিছুই হয় না। তাই জিনেরা ওনাকে মেরে ফেলার আগে আল্লাহ তাঁর এক নেক বান্দাকে দিয়ে জিনেদের বাধা দেন এবং সেই নেক বান্দা জিনেদের কাছে ওয়াদা করে ফায়জুন্নেসার তিন পূর্বপুরুষ যা করেন নি তিনি তা ফায়জুন্নেসাকে দিয়ে করাবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ফায়জুন্নেসা এখনও বেঁচে আছেন। নচেৎ কবেই ঐ জলমহলে ওনার লাশ পাওয়া যেত।

ফায়সালের কথা শুনে লুৎফা বেগম বুঝতে পারলেন এই ম্যানেজারই আল্লাহর সেই নেক বান্দা। একে দিয়েই আল্লাহ চৌধুরী বংশের উপর থেকে জিনেদের দুশমনির অবসান করিয়েছেন। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সময় চোখ দু'টো পানিতে ভরে উঠল। তার আসল পরিচয় জানার জন্য ওনার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলেও ওয়াদার কথা চিন্তা করে কিছু বলতে পারলেন না।

ফায়সাল লুৎফা বেগমের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, আপনি আল্লাহর ঈমানদার বান্দি, তাই স্বামীর ও মেয়েদের কোনো অন্যায় মেনে নিতে না পেরে অনেক প্রতিবাদ করেছেন। ফলে স্বামীর অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। মেয়েও আপনাকে অনেক অপমান করেছেন। আপনি সেসব সহ্য করে তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য সব সময় আল্লাহর দরবারে দো'য়া করেন। আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দা-বান্দিকে নিরাশ করেন না। তবে কখন সেই দো'য়ার প্রতিফল বান্দার জন্য মঙ্গল হবে সে খবর তিনিই জানেন এবং সেই সময় দিয়েও থাকেন। এখন যা কিছু জানলেন, তা আপনার নেক দো'য়ার প্রতিফল। আপনি আমার জন্য দো'য়া করবেন, "আল্লাহ যেন আমাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেন ও ঈমানদারীর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার তওফিক দেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দেন।

এবার যাওয়ার অনুমতি দিন বলে ফায়সাল দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ভুলেও আপনার মেয়েকে এসব কথা জানাবেন না। তারপর লুৎফা বেগম কিছু বলার আগেই সালাম দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

ফায়জুন্নেসা ঘুম থেকে উঠেন আটটায়। আজ উঠে কুলসুমের মুখে ম্যানেজার ফিরেছে শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর নাস্তা খেয়ে নিচতলার ড্রইংরুমে এসে ফায়সালকে ডেকে পাঠালেন।

ফায়সাল এসে সালাম দিল।

সালামের উত্তর দিয়ে ফায়জুন্নেসা বসতে বলে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আপনার মতো ছেলে এরকম একটা কাজ করবেন ভাবতেই পারি নি।

ভুল হয়ে গেছে মাফ করে দিন।

কোথায় ছিলেন এই ক'দিন।

ফায়সাল যে কথা লুৎফা বেগমকে বলেছিল, সে কথা বলল।

কাজটা কি?

মাফ করবেন, বলতে পারব না।

আমার স্টেটের কাজ, বলতে পারবেন না কেন?

ফায়সাল মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

কি হল উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

দয়া করে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। পরে আপনি নিজেই জানতে পারবেন।

ফায়জুন্নেসা রেগে গেলেও সংযত কণ্ঠে বললেন, কোথায় গিয়েছিলেন, ঢাকায়?

মাফ করবেন, তাও বলতে পারব না।

ফায়জুন্নেসা রাগ সহ্য করতে পারলেন না। কড়া স্বরে বললেন, আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

সেজন্য আবার মাফ চাইছি।

আরো রেগে উঠে ফায়জুন্নেসা বললেন, আপনি শিক্ষিত ছেলে হয়ে মালিকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কত বড় অন্যায় করছেন বুঝতে পারছেন না?

তা পারব না কেন? একটা সত্য ঘটনা বলছি শোনেন, খলিফা হারুণ-অর-রশিদ একদিন খাওয়ার পর চিলিমচিতে হাত ধুচ্ছিলেন, একজন ক্রীতদাস ওনার হাতে পানি ঢালছিল। হঠাৎ হাত ফসকে পানির পাত্রটা চিলিমচিতে পড়ে যায়। চিলিমচির পানি খলিফার চোখে মুখে ছিটকে পড়ে। খলিফা ভীষণ রেগে উঠে ক্রীতদাসের দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকালেন। ক্রীতদাস জানে এই অপরাধের জন্য খলিফা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। এমন কি মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। সে ছিল আল্লাহর ঈমানদার বান্দা। আর ঈমানদার বান্দারা কোনো শাস্তি বা মৃত্যুকে ভয় করে না। তাই খলিফা অগ্নি দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে বলল, আল্লাহ রাগকে দমন করতে বলেছেন। আর আমাদের নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "ক্রোধ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তাহা হজম করে, বিচারের দিন আল্লাহ

সমস্ত সৃষ্টি জীবকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে যে-কোনো হুর পছন্দ করিয়া লইতে বলিবেন।"[১]

ক্রীতদাসের কথা শুনে খলিফা মুচকি হেসে বললেন, তোমাকে মাফ করে দিলাম।

ক্রীতদাস আবার বলল, অপরাধীকে যারা ক্ষমা করেন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) ভালবাসেন।

এবার খলিফা বললেন, যাও, তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

গল্পটা শুনে ফায়জুন্নেসার রাগ পড়ে গেল। বললেন, ঠিক আছে, মাফ করে দিলাম। তবে ভবিষ্যতে এভাবে না জানিয়ে কোথাও যাবেন না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কাল জলমহলের মাছ ধরার কথা মনে আছে?

জি, আছে?

আজিজ গুণ্ডাবাহিনী পাঠাবে মাছ লুট করার জন্য, সে ব্যাপ্যারে কি করবেন?

মনে হয় তিনি গুণ্ডাবাহিনী পাঠাবেন না।

আপনার মনে কি হয় না হয় তা জানতে চাই নি, কি প্রস্তুতি নিয়েছেন জানতে চেয়েছি।

প্রতিবারে জলমহলে মাছ ধরার সময় দাঙ্গায় উভয় পক্ষের অনেকেই হতাহত হয়। তাই আমি দাঙ্গা করতে চাই না। সে জন্য যা কিছু করার আমি করব। এ ব্যাপারে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ আমি কামিয়াব হব।

কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে না পারেন, তা হলে কি বিরাট ক্ষতি আমাদের হবে ভেবেছেন?

জি, ভেবে চিন্তেই কথাটা বলেছি। বললাম না, ইনশাআল্লাহ আমি কামিয়াব হব?

ফায়জুন্নেসা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, শুনুন, আপনি কি করবেন না করবেন, জানি না। আমি চাই, আমাদের বাহিনী তৈরি হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, তাই হবে।

হাশেমের কাছে শুনেছি, আপনি নাকি একদিন আজিজদের গ্রামে গিয়েছিলেন সে সময় তার গুণ্ডাবাহিনী খুন করার জন্য আপনার উপর হামলা করেছিল, কথাটা কি সত্য?

জি সত্য।

ওদের হাত থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলেন কি করে?

আল্লাহ ফিরিয়ে এনেছেন।

---

(১) বর্ণনায় : হযরত সহল (রাঃ) - আবুদাউদ, তিরমিজী।

ফায়জুন্নেসা চিন্তা করলেন, কালই ম্যানেজারের কথার সততা জানা যাবে। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, এবার আপনি আসুন।

ফায়সাল বলল, ছুটি দিতে হবে।

কেন?

বাড়ি যাব।

কবে যাবেন?

পরশু।

কত দিনের ছুটি চান?

পনের দিনের।

ফায়সাল এর আগে এক সপ্তাহের বেশি ছুটি নিয়ে বাড়ি যায় নি। পনের দিনের কথা শুনে ফায়জুন্নেসা বললেন, এবারে এত বেশি দিন কেন?

প্রয়োজন আছে, যদি মনে করেন এত দিন ছুটি দেয়া যাবে না, তা হলে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী দিন।

ঠিক আছে, পনের দিনই মঞ্জুর করলাম।

ধন্যবাদ, বলে ফায়সাল সালাম বিনিময় করে বেরিয়ে এল।

নির্দিষ্ট দিনে জলমহলে নির্বিঘ্নে মাছ ধরে বিক্রি করা হল। আজিজের গুণ্ডাবাহিনী মাছ লুট করতে আসে নি জেনে শুধু লুৎফা বেগম ও ফায়জুন্নেসা নয়, ফায়সালের উপর চৌধুরী বাড়ির সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেল।

ঐ দিন এক সময় ফায়জুন্নেসা মৃণালবাবুকে ডেকে ম্যানেজারের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং এমন কিছু বিষয় জানতে পারলেন, যা শুনে ভীষণ অবাকও হলেন। হঠাৎ মনে পড়ল, ম্যানেজার বলেছিলেন, "স্বপ্না খুব তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবে।" কই আজ আট দশদিন হয়ে গেল স্বপ্না তো এল না? তা হলে কি সে ফিরে এসে ঢাকাতেই আছে? মায়ের কাছে গিয়ে কথাটা বললেন।

লুৎফা বেগম বললেন, ফিরে এসে যদি ঢাকাতে থাকে, তা হলে নিশ্চয় চিঠি দিয়ে জানাত। আমার মন বলছে স্বপ্না এখনও ফেরে নি।

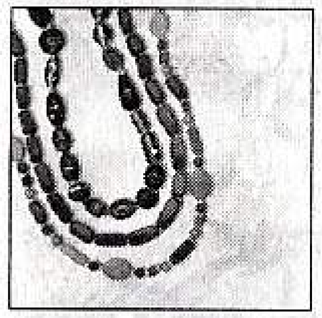

হারেস মাঝে মাঝে ঢাকা গিয়ে মেয়ে স্বপ্নাকে দেখে আসতেন, কিন্তু বাড়িতে নিয়ে আসতেন না। মেয়ের প্রতি ফায়জুন্নেসার তেমন টান না থাকলেও মাঝে মধ্যে স্বামীর সঙ্গে তাকে দেখার জন্য যেতে চাইতেন। হারেস রাজি না হয়ে বলতেন, মেয়েকে আমি নিজের মতো করে মানুষ করব, তাই আমি চাই না তুমি তার সঙ্গে দেখা কর। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায় রাগারাগি হত।

লুৎফা বেগম মেয়ে ফায়জুন্নেসার উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি জামাই-এর হয়ে মেয়েকে বলতেন, "জামাইয়ের সঙ্গে আমিও একমত। স্বপ্নার উপর তোর ছায়াও যেন না পড়ে। তোর মা হওয়ার যোগত্যা নেই। যে দিন যোগ্যতা অর্জন করতে পারবি, সেদিন স্বপ্নার কাছে মা বলে পরিচয় দিবি।" তারপর থেকে ফায়জুন্নেসা মেয়েকে দেখতে যাওয়ার অথবা তাকে নিয়ে আসার ব্যাপারে স্বামী খুন হওয়ার আগে পর্যন্ত তাকে ঠিকানা অথবা মেয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস করেন নি। এমন কি আজিজকে নিয়ে যতদিন প্রেম সাগরে সাঁতার কেটেছেন, ততদিন মেয়ের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন, "মেয়ে স্বপ্না যেন বাড়িতে এসে আজিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল, কে ইনি? বাবা মারা যাওয়ার পর ইনাকে কি তুমি বিয়ে করেছ?"

মেয়েকে দেখে ফায়জুন্নেসা এত লজ্জা পেলেন যে, সরে বসে মাথা নিচু করে ছিলেন। কোনো কথা বলতে পারলেন না।

তুমি কথা বলছ না কেন মা? তা হলে আমার ভাবা কি অনুচিত হবে, ইনি তোমার উপপতি? ছিঃ মা ছি; তুমি নারী জাতির কলঙ্ক। তোমার মতো চরিত্রহীন মেয়ের পেটে জন্মেছি ভেবে নিজেকে খুব ঘৃণা হচ্ছে। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি, তোমাকে কখনও মা বলে স্বীকৃতি দেব না। কথা শেষ করে স্বপ্না সেখান থেকে চলে গেল।

আর তখনই ফায়জুন্নেসার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই স্বপ্ন দেখার পর থেকে বার বার যেমন মেয়ের কথা মনে পড়তে লাগল, তেমনি মনে পাপবোধ জেগে উঠল। তারপর থেকে আজিজকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন এবং শেষমেষ আজিজকে চাকরি থেকে বরখাস্থ করে তাড়িয়ে দেন। তারপর মেয়ের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু মেয়ে কোথায় থাকে, এতদিন তার খবরচপত্র কে দিচ্ছে, কিছুই জানেন না। ভাবলেন, মা নিশ্চয় নাতনির সবকিছু জানেন।

একদিন মাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বপ্না কোথায় থাকে জান?

লুৎফা বেগম হাশেমের কাছ থেকে মেয়ের সব কিছুর খবর রাখেন আর মেয়েকে হেদায়েত করার জন্য সব সময় দো'য়া করেন। আজিজকে বরখাস্থ করার খবর যেদিন শোনেন, সেদিন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

আজ তাকে স্বপ্নার কথা জিজ্ঞেস করতে গম্ভীরস্বরে বললেন, এত বছর পর মেয়ের খবর জানতে চাচ্ছিস কেন? যদি বলি সে নেই, আল্লাহ তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন?

ফায়জুন্নেসা চমকে উঠে কান্নাজড়িতস্বরে বললেন, এমন কথা বলো না মা। তুমি একদিন বলেছিলে, "যেদিন মা হওয়ার যোগ্য হবি, সেদিন মেয়ের কাছে মা বলে পরিচয় দিবি।" এত বছর পর কেন তার খবর জানতে চাচ্ছি, নিশ্চয় বুঝতে পারছ। মন বলছে, তোমার সঙ্গে স্বপ্নার যোগাযোগ আছে।

হ্যাঁ, আছে। তুই কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাস?

হ্যাঁ, মা। তাকে দেখার জন্য মন খুব অস্থির হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সে তো পড়াশোনা শেষ না করা পর্যন্ত আসবে না।

আমি যাব তার সঙ্গে দেখা করতে, তুমি ঠিকানা দাও।

ঠিকানা দিলেও কাজ হবে না।

কেন?

স্বপ্না তোর সঙ্গে দেখা করবে না।

সে আমি বুঝব, তুমি ঠিকানা দাও।

লুৎফা বেগম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোর কারণে আজ পনের বছর তাকে দেখতে না পেয়ে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছি, তা আল্লাহ ভালো জানেন, কথা শেষ করে চোখ মুছলেন।

ফায়জুন্নেসা মায়ের দু'পা জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বললেন, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমাকে মাফ করে দাও মা। তারপর আবার বললেন, হয় ঠিকানা দাও, না হয় তাকে আনাবার ব্যবস্থা কর।

লুৎফা বেগম পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, উঠে বস। বসার পর বললেন, তোর কাছ থেকে এই কথা শোনার জন্য এত বছর বুকে পাথর চাপা দিয়ে সবর করে ছিলাম। আজ তোর কথা শুনে সেই পাথর আপনা থেকে সরে গেছে। তাই স্বপ্নাকে দেখার জন্য আমিও অস্থির হয়ে পড়েছি। ওর ঢাকার পড়াশোনা শেষ। আরও পড়াশোনা করার জন্য আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে জানার পর ভেবেছিলাম, মৃণালবাবু ও হাসেমকে নিয়ে এয়ারপোর্টে তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আল্লাহ যখন তোর সুমতি দিয়েছেন তখন তুইও আমাদের সঙ্গে যাবি।

খুশিতে ফায়জুন্নেসার চোখে পানি এসে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, স্বপ্নাকে কিছুদিনের জন্য এখানে আনা যায় না?

না।

কেন মা?

সে কথা এখন বলতে পারব না।

ফায়জুন্নেসা মাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, তা হলে এক কাজ করলে হয় না, আমরা ঢাকায় গিয়ে হোটেলে থেকে আমেরিকা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওকে আমাদের সঙ্গে রাখব?

না, তাও সম্ভব নয়। ও যেখানে থাকে সেখানকার সুপার অনুমতি দেবেন না।

আমি মা, আমি বললেও অনুমতি দেবেন না?

না, দেবেন না। তা ছাড়া এত বছর মেয়ের খোঁজ খবর রাখিস নি, এখন মা বলে পরিচয় দিলেও স্বপ্না তোর সঙ্গে দেখা করবে বলে মনে হয় না। এয়ারপোর্ট ছাড়া তার সঙ্গে কিছুতেই তোর দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তাই যা বলছি শোন, আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে ওর এখানে ফিরে আসার কথা। এর মধ্যে তুই চিঠি দিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবি। তুই তো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী, চিঠিতে এমন কিছু লিখবি, যাতে সে ফিরে আসে।

যদি ফিরে না এসে ওখানে থেকে যায়?

আমাকে কথা দিয়েছে ফিরে আসবে। তবে আমি যদি মরে যাই, তা হলে কি করবে বলতে পারছি না। চৌধুরী বংশের শেষ প্রদীপ স্বপ্না। সে যাতে চৌধুরী স্টেটের হাল ধরতে পারে, সেজন্য হারেস তাকে সেইভাবে মানুষ করার ব্যবস্থা করেছিল। হারেস নেই, এখন তাকে ফিরিয়ে এনে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়া তোর কর্তব্য।

আমেরিকা যাওয়ার দিন এয়ারপোর্টে স্বপ্নার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অল্প সময় আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলেন ফায়জুন্নেসা। সে সময় চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মেয়েকে বলেছিলেন, মানুষ মাত্রই ভুল করে, তবে আমি হয়তো গুরুতর ভুল করেছি। সেজন্যে মা হয়ে তোর কাছে ক্ষমা চাইছি। বল মা, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিস? পড়াশোনা শেষ করে ঘরে ফিরে আসবি বল?

পরিচিত হওয়ার পর থেকে স্বপ্না একটা কথাও বলল না, শুধু মায়ের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। মার ক্ষমা চাওয়া ও ঘরে ফেরার কথা শুনেও কিছু বলল না, একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

লুৎফা বেগম নাতনিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কিছু বলছিস না কেন? তুই বোধ হয় জানিস না, আল্লাহ ও রসুল (দঃ) এর পরেই মা বাবার স্থান। মায়ের স্থান পিতার উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে। হাদিসে আছে, "এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল, সন্তানের উপর তাহার পিতা-মাতার কি হক (দাবি) আছে? তিনি বলিলেন, তাহারা উভয়েই তোমার বেহেশত ও তোমার দোযোখ।"[১]

(১) বর্ণনায় : হযরত আবু ওমাবাহ (রাঃ) - মেশকাত।

সন্তানের কর্তব্য বিদেশ যাওয়ার সময় মা-বাবার অনুমতি নেয়া। তোর বাবা নেই, এখন মা-ই তোর মা-বাবা। মনে রাখিস, মা-বাবার মনে কষ্ট দিয়ে কেউ জীবনে সুখী হতে পারে না। মা-বাবার ভুল ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখাও সন্তানের কর্তব্য। এখন তোর উচিত মাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার অনুমতি নেয়া ও তার কথার উত্তর দেয়া।

দীর্ঘ পনের ষোল বছর মা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে নি বলে স্বপ্নার মনে রাগ ও অভিমানের পাহাড় জমে ছিল। তাই এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। নানির কথা শুনে সেই রাগ ও অভিমান কর্পূরের মতো উড়ে গেল। মা বলে ফায়জুন্নেসাকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে লাগল।

এতবছর পর মা ডাক শুনে ফায়জুন্নেসাও চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। ভিজে গলায় বললেন, বল মা, লেখাপড়া শেষ করে তুই আমার কোলে ফিরে আসবি?

স্বপ্না সামলে নিয়ে চোখ মুখ মুছে প্রথমে নানিকে ও পরে মাকে কদমবুসি করে বলল, হ্যাঁ মা ফিরে আসব। এবার তুমি আমাকে যাওয়ার অনুমতি দাও।

এরপর থেকে ফায়জুন্নেসা প্রতি মাসে মেয়েকে চিঠি দেন। স্বপ্নাও চিঠির উত্তর দেয়। মাস তিনেক আগে দেশে ফেরার কথা জানালেও নানি ও মাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য কবে ফিরবে জানায় নি।

বাসের চেয়ে ট্রেনের জার্নি আরামদায়ক। তাই ফায়সাল ট্রেনে যাতায়াত করে। নীলফামারী থেকে ট্রেনে রংপুর এসে ঢাকার ট্রেনে উঠতে হয়। ঐ ট্রেন ছাড়ে সন্ধ্যে সাতটায়। তাই ফায়সাল ঐদিন সকালে রওয়ানা না হয়ে বিকেল পাঁচটায় চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরোল।

এদিকে রিকশা খুব কম চলাচল করে। তবে মাইল দু'য়েক দূরে একটা বাজার আছে, ওখানে সব সময় রিকশা পাওয়া যায়। আজ ভাগ্যগুণে কিছুদূর আসার পর পিছন থেকে আসা একটা খালি রিকশা পেয়ে গেল।

বাজারের কাছাকাছি এসেছে এমন সময় সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে রিকশাওয়ালাকে ফায়সাল সাইড দিতে বলল।

রিকশাওয়ালা বলল, দেখছেন না, সাইড দেয়ার মতো রাস্তাটা চওড়া নয়?

ফায়সাল চিন্তিত হয়ে বলল, তা হলে এখন কি হবে?

রিকশাওয়ালা বলল, কি আবার হবে? গাড়ির ড্রাইভারকে ব্যাক গিয়ারে বাজারে যেতে হবে।

কিছুটা দূর থেকে ট্যাক্সি ড্রাইভার হর্ণ বাজাচ্ছিল। সাইড না পেয়ে রিকশার সামনে এসে ব্রেক করে বলল, সাইড দেয়ার জন্য আগের থেকে হর্ণ বাজালাম, তুমি সুবিধে মতো জায়গায় দাঁড়াতে পারতে।

রিকশাওয়ালা বলল, সাইড দেয়ার মতো জায়গা থাকলে তো দাঁড়াব। বাজার কাছেই, ওখানে সাইড দেয়ার জায়গা আছে, আপনি ব্যাক গিয়ারে বাজারে চলুন।

রিকশাওয়ালার কথা শুনে ড্রাইভার রেগে গেল। সামনের রাস্তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কি করবে জানার জন্য পিছনে বসা প্যাসেঞ্জারের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ততক্ষণে ফায়সাল রিকশা থেকে নেমে পিছনের সিটে স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

স্বপ্না আজ ভোরে ঢাকায় পৌঁছে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে বাড়ি আসছে। ড্রাইভারের তাকানর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রিকশাওয়ালার কথা যাচাই করার জন্য গাড়ি থেকে নামতেই ফায়সালের চোখে চোখ পড়ে গেল। তাকে ঐভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে খুব রেগে গেল। বলল, আপনার কি ভদ্রতা জ্ঞানও নেই? দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের ছেলে।

স্বপ্নার কথা ফায়সালের কানে গেল না। কয়েক বছর ধরে যে মেয়েকে স্বপ্নে দেখে আসছে, সেই মেয়ে আজ তার সামনে। তাই বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

স্বপ্না চৌধুরী বংশের মেয়ে না হলেও নাতনি। তার রক্তে চৌধুরী বংশের রক্ত। তাই ছেলেটাকে একইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও তার কথার উত্তর না পেয়ে আরো রেগে গেল। এগিয়ে এসে ফায়সালের গালে কষে একটা চড় মেরে বলল, অভদ্রদেরকে এইভাবে ভদ্রতা শেখাতে হয়।

স্বপ্নার চড় খেয়ে ফায়সাল বাস্তবে ফিরে এল। যন্ত্রণা অনুভব করে গালে হাত বুলোতে বুলোতে রিকশাওয়ালাকে বলল, রিকশা রাস্তা থেকে জমিতে নামাও।

রিকশাওয়ালা ঘটনাটা দেখেছে। তাই কিছু না বলে রিকশা রাস্তা থেকে জমিতে নামাল।

ততক্ষণে স্বপ্না গাড়িতে উঠে বসেছে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি চলে যাওয়ার পর রিকশাওয়ালা ফায়সালকে বলল, আমি একা রিকশা রাস্তায় তুলতে পারব না, আপনিও ধরুন।

রাস্তায় রিকশা তোলার পর ফায়সাল উঠে বসল।

রিকশাওয়ালা রিকশা চালাতে চালাতে বলল, একটা মেয়ে আপনার গালে চড় মারল আর আপনি তাকে কিছু না বলে তার গাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি হলে বলে থেমে গেল।

ফায়সাল মৃদু হেসে বলল, কি করতেন? তার গালে আপনিও চড় মারতেন?

হ্যাঁ, মারতামই তো। মেয়ে হয়ে যদি ছেলের গালে চড় মারতে পারে; তা হলে ছেলে হয়ে পারতাম না কেন?

মেয়েরা যা করতে পারে সবক্ষেত্রে ছেলেরা তা পারে না।

এটা আপনি ঠিক বলেন নি, বরং মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশি পারে।

তাই যদি হয়, তা হলে মেয়েরা সন্তান পেটে ধরতে পারে, ছেলেরা পারে না কেন?

এই কথা শুনে রিকশাওয়ালা থতমত খেয়ে গেল। কোনো উত্তর দিতে পারল না।

ফায়সাল বলল, এখন বুঝলেন তো, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সবাই সব কাজ করতে পারে না।

রিকশাওয়ালা আর কিছু না বলে চুপ করে রইল।

স্বপ্না ছেলেবেলায় মায়ের তেমন আদর যত্ন পাই নি। চাকরানি তাসলিমা তাকে দেখাশোনা করত। এমন কি তার কাছেই ঘুমাত। তাই মায়ের প্রতি তার তেমন টান ছিল না। বরং মাকে ভয় করত। তাই বাবা যখন তাকে ঢাকায় এনে হোমে রেখে যায় তখন মায়ের জন্য মন খারাপ হয় নি। তারপর বড় হয়ে যখন জ্ঞান হল তখন মা তাকে একবারও দেখতে আসে নি বলে মায়ের উপর প্রচণ্ড অভিমান হয়। সেজন্যে বাবা এলে তাকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করত না। এমন কি বাবা মারা যাওয়ার পর নানি লুৎফা বেগম যখন চিঠি দিয়ে সে কথা জানাল তখন বাবার জন্য অনেক কান্নাকাটি করলেও বাড়িতে আসে নি এবং মায়ের কথাও নানিকে জানাতে বলে নি। তারপর নানির সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ থাকলেও মাকে কোনো চিঠি দেয় নি। অবশ্য মাঝে মধ্যে মাকে চিঠি দিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে তার খবর নেয়ার খুব ইচ্ছা হত। তাই একবার বাড়িতে যাওয়ার জন্য লোক পাঠাতে নানিকে জানিয়েছিল। উত্তরে লুৎফা বেগম জানিয়েছিলেন, "লেখাপড়া শেষ করে আসবি। তোর বাবাও আমাকে সে কথা বলেছিল।" তাই নানির চিঠি পাওয়ার পর মাকে চিঠি দেয়ার ও বাড়িতে আসার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলেছিল। আমেরিকা যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে প্রায় পনের যোল বছর পর নানিকে ও মাকে দেখে সে সময় মায়ের আচরণে বেশ অবাক হয়ে ভেবেছিল, যে মা আজ এত বছর মেয়ের খোঁজ খবর রাখে নি, এক বারের জন্যে দেখতেও আসে নি, এমন কি একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় নি, সেই মা তাকে আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসার জন্য চোখের পানি ফেলে আকুতি মিনতি করছে কেন? তখন অভিমানে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চায় নি। নানির কথায় অভিমান ধরে রাখতে পারে নি এবং আমেরিকায় গিয়ে মায়ের সঙ্গে চিঠি দেয়া-নেয়া করে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মেছে। তারপর বাড়িতে এসে মা ও নানির স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়েছে।

একদিন লুৎফা বেগম চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস ও ওনাদের করুন মৃত্যুর কথা নাতনিকে বললেন।

স্বপ্না পূর্ব পুরুষদের মৃত্যুর ঘটনা শুনে দুঃখ পেলেও জিনেদের ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না। বলল, ওসব কল্প কাহিনী।

লুৎফা বেগম বললেন, আমি এ বাড়ির বৌ হয়ে এসে আমার শাশুড়ি যখন আমাকে এসব কথা বলেছিলেন তখন আমিও বিশ্বাস করি নি। তারপর ওনার শাশুড়ি যা কিছু বলেছিলেন, সেসব বলে বললেন, তুই চৌধুরী বংশের একমাত্র প্রদীপ। তোকে নিয়ে আমি ও তোর মা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তবে এখন আল্লাহ আমাদেরকে সেই চিন্তা থেকে নিস্কৃতি দিয়েছেন।

স্বপ্না কপাল কুচকে জিজ্ঞেস করল, কি ভাবে?

আমাদের স্টেটের ম্যানেজার নিজের থেকে একদিন আমাদেরকে বললেন, আপনারা স্বপ্নার জন্য কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। পূর্ব পুরুষদের মতো ওনার জীবনে কিছু ঘটবে না।

স্বপ্না হেসে উঠে বলল, ম্যানেজার বললেন আর আপনারা ওনার কথা বিশ্বাস করে ফেললেন? আসলে কি জানেন নানি, ওসব কথা উনিও বিশ্বাস করেন নি। তাই নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

তোর কথা ঠিক নয়। ম্যানেজার খুব ধার্মিক। এখানে জয়েন করার কিছু দিনের মধ্যে এ বাড়ির পরিবেশ পাল্টে দিয়েছে। ছোট বড় সবাইকে আপনি করে বলে। এমন কি চাকর-চাকরানিদেরকেও। সবাইকে তালিম দিয়ে নামায ধরিয়েছে। তোর মাও নামায পড়ত না। গতকাল থেকে পড়ছে। আর সেটা ম্যানেজারের কারণেই। আজিজের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার কথা তোকে তো বলেছি। সেই আজিজকেও মিত্র বানিয়েছে। এখনও এক বছর হয় নি ম্যানেজার হয়ে এসেছে, এর মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। উপযাজক হয়ে সেই ছেলে আমাদেরকে মিথ্যে প্রবোধ দেবে, তা হতে পারে না।

স্বপ্না চিন্তা করল, ম্যানেজার ধর্মের মুখোশ পরে আজিজের মতো আখের গোছাবার তালে নেই তো? যদি তাই হয়, তা হলে বাছাধনকে জেলের ঘানি টানাব।

লুৎফা বেগম বললেন, কি রে, কি ভাবছিস?

না, তেমন কিছু না, শুনেছি, ম্যানেজার ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন, কবে ফিরবেন?

তুই যেদিন এলি, ঐদিন পনের দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

ওনার বাড়ি কোথায়?

ঢাকায়।

আচ্ছা, ওনাকে কি আমাদের পূর্ব পুরষদের কথা আপনারা বলেছেন?

না।

আমার মনে হয়, উনি কারো কাছ থেকে সবকিছু জেনেছেন। ঠিক আছে, আসার পর আমি আলাপ করে দেখব, কতটা ভালো।

স্বপ্না প্রায় প্রতিদিন হাশেমের সঙ্গে স্টেটের সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করল, ম্যানেজার কেমন লোক বলতে পার?

হাশেম বলল, ওনার মতো ভালো ছেলে আমি জীবনে দেখি নি।

স্বপ্না মনে করেছিল ম্যানেজার বয়স্ক লোক। হাশেম ছেলে বলতে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ম্যানেজারকে ছেলে বলছ কেন? উনি বয়স্ক লোক না?

না মা, ওনার বয়স বড় জোর আঠাশ কি ত্রিশ।

তাই না কি?

শুধু তাই নয়, দেখতেও খুব সুন্দর। যেমন রঙ তেমনি স্বাস্থ্য। তা ছাড়া উনি সবদিকে এক্সপার্ট।

সবদিকে এক্সপার্ট মানে?

মানে, উনি সব ধরনের মারামারীতে খুব পটু। ধর্মের আইন নিজে যেমন মেনে চলেন, অন্যদেরকেও মেনে চালাবার চেষ্টা করেন। আর কি অমায়িক ব্যবহার। গ্রামের গরিব-বড়লোক, ছোট-বড় সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলেন।

সবার মুখে ম্যানেজারের প্রশংসা শুনে স্বপ্নার দৃঢ় ধারণা হল, ম্যানেজার কারো কাছ থেকে চৌধুরী বংশের খোঁজ খবর নিয়ে রাজকন্যাসহ রাজত্ব পাওয়ার আশায় এখানে এসেছে এবং ধর্মের মুখোশ পরে সকলের মন জয় করেছে।

একদিন অফিসের বড়বাবু মৃণালবাবুর সাহায্যে ম্যানেজারের খাতাপত্র চেক করতে লাগল। পাঁচ ছ'দিন আক্লান্ত পরিশ্রম করে কারচুপির কোনো প্রমাণ না পেয়ে ভাবল, এটাও ম্যানেজারের একটা চাল।

চৌদ্দ দিন ছুটি কাটিয়ে আজ রাত আটটার সময় ফায়সাল কর্মস্থলে ফিরে এল।

নটার সময় আকলিমা রাতের খাবার নিয়ে এসে বলল, আপনি যে দিন বাড়ি গেলেন, ঐদিন মালেকিনের মেয়ে বিদেশ থেকে এসেছেন।

ফায়সাল কিছু না বলে খেতে বসল।

আকলিমা মনে করেছিল, তার কথা শুনে ম্যানেজার খুশি হয়ে ওনার সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করবেন। চুপচাপ খেতে দেখে আবার বলল, লেখাপড়া করার জন্য ওনার বাবা সাত বছর বয়সে ঢাকায় নিয়ে........

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ফায়সাল বলল, ওনার কথা বলার দরকার নেই, আমি সব জানি।

আকলিমা আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। ফায়সালের খাওয়া হয়ে যেতে বাসন পেয়ালা নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন ফায়সাল অফিসে কাজ করছিল। হঠাৎ দরজার দিকে তাকাতে স্বপ্নাকে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, আসুন।

স্বপ্না ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য কিছুক্ষণ আগে এসে ফায়সালকে চিনতে পেরে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, আসার দিন তা হলে ইনারই গালে চড় মেরেছে। ফায়সাল তার দিকে তাকাতে চোখে চোখ পড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর প্রথমে ফায়সাল মৃদু হেসে বলল, সেদিনের ঘটনায় আমি কিছু মনে করি নি। প্লীজ, ভিতরে এসে বসুন।

স্বপ্না ভিতরে এসে ফায়সালের সামনের চেয়ারে বসল।

ফায়সাল বসে বলল, আমি কিন্তু আপনাকে সালাম দিয়েছি।

আমি যেখানে মানুষ হয়েছি, তারা সালাম কি ও কেন শেখায় নি।

তা হলে আমি শেখাই?

না, প্রয়োজন হলে নিজেই শিখে নেব।

ঠিক আছে, কিছু বলার থাকলে বলুন।

বলতে আসি নি, পরিচয় করতে এসেছি।

মাফ করবেন, কথাটা ঠিক বলেন নি।

স্বপ্না রাগের সঙ্গে বলল, মানে?

মানে, এখানে আসার পর আপনার পরিচয় আমি যেমন জানি, আপনিও তেমনি জানেন। শুধু আমাকে দেখার বাকি ছিল। তাই দেখতে এসেছেন।

এবার স্বপ্না রাগের পরিবর্তে অবাক হল, জিজ্ঞেস করল, আপনার বাকি ছিল না?

আপনাকে আমি অনেক দিন আগে থেকে দেখে আসছি। শেষবারে দেখেছি পনের দিন আগে বাড়ি যাওয়ার সময় রাস্তায়।

স্বপ্না আরো অবাক হলেও তা প্রকাশ না করে রাগের সঙ্গে বলল, মিথ্যের বেড়াজাল বিছিয়ে এখানকার সবাইকে ধোঁকা দিতে পারলেও আমাকে পারবেন না। জানেন না, মিথ্যে দিয়ে সত্যকে বেশি দিন ঢেকে রাখা যায় না?

কেন জানব না? আর জানি বলেই কখনও মিথ্যা বলি না, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোনো কাজও করি না।

তা হলে কেন বললেন, আমাকে অনেক দিন থেকে দেখে আসছেন?

কথাটা সত্য, তাই বলেছি।

কোথায় দেখেছেন?

মাফ করবেন এখন বলা সম্ভব নয়।

কখন সম্ভব হবে?

সময় মতো আপনি নিজেই জানতে পারবেন।

তার কথা শুনে স্বপ্না খুব রেগে গেল। রাগ সামলাবার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমাকে যদি অনেক দিন থেকে দেখে থাকেন, তা হলে সে দিন রাস্তায় অভদ্রের মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কেন?

মাফ করবেন, সে কথাও বলা এখন সম্ভব নয়।

এবার আর স্বপ্না রাগ সামলাতে পারল না। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আমাকে চেনেন?

ফায়সাল মৃদু হেসে বলল, "সাত খণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসি।" আপনার প্রশ্নটা সে রকম হয়ে গেল না?

সাট আপ, যা জিজ্ঞেস করেছি উত্তর দিন।

চিনব না কেন? আপনি মরহুম ইনসান চৌধুরীর নাতনি জেবুন্নেসা ওরফে স্বপ্না। যিনি চৌধুরী বংশের একমাত্র প্রদীপ ও চৌধুরী স্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

তাই যদি জানেন, তা হলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত নিশ্চয় জানেন?

জি, জানি।

তা হলে আমার সঙ্গে হেঁয়ালী করছেন কেন? আমার প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছেন না কেন?

আমি হেঁয়ালী করি নি, তবে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিই নি, সেগুলো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কারো উচিত নয়।

ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি মালিকের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখন মালিকের জানার অধিকার নিশ্চয় আছে?

তা আছে, তবে কেউ অপারগ হলে মালিকের জোর খাটিয়ে জানা ঠিক নয়।

স্বপ্না গর্জে উঠল, একজন কর্মচারী হয়ে মালিককে জ্ঞান দান করছেন?

আপনি ক্রমশ রেগে উঠছেন। রাগ খুব খারাপ জিনিস। রাগের বশে মানুষ এমন কাজ করে ফেলে, সারাজীবনেও যার ক্ষতি পূরণ করা যায় না। তাই রাগকে আল্লাহ হজম করতে বলেছেন। শুনুন, আপনাকে জ্ঞান দেয়ার জন্য কিছু বলি নি। যা সত্য তাই বলেছি।

স্বপ্না আর ধৈর্য ধরতে পারল না, উচুঁ গলায় বলল, মিথ্যুক, ভণ্ড কোথাকার, এক্ষুনি আপনাকে বিদায় করে দিতে পারি জানেন?

জি, জানি। আরো জানি, আপনি তা করতে পারবেন না।

পারি কি না দেখবেন?

ফায়সাল হাসি মুখে বলল, আপনার মাও অনেকবার আমাকে বিদায় করতে চেয়েছেন; কিন্তু পারেন নি। কথাটা সত্য কিনা ওনাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।

এই পনের দিনেই মায়ের মন মেজাজ স্বপ্না জেনে গেছে। তাই ফায়সালের মুখে মায়ের কথা শুনে চুপ করে গেল।

ফায়সাল তা বুঝতে পেরে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, আপনি কি ভাববেন জানি না, এতকিছুর পরও আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এতটুকু কমে নি। একটা কথা বলছি, রাগ করবেন না। জ্ঞানীরা বলেছেন, "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।" স্বপ্নাকে তার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাতে দেখেও আবার বলল, এবার আপনি আসুন। পনের দিন ছিলাম না, অনেক কাজ জমা হয়ে আছে। প্রয়োজনে অন্য সময় বা অন্যদিন আলাপ করবেন।

স্বপ্না রাগের সঙ্গে বলল, আপনি ভীষণ চালাক ও পাকা অভিনেতা। শুনে রাখুন, আপনি যা কিছু হন না কেন, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। কিছুদিনের মধ্যে আপনার মুখোশ সবার কাছে খুলে দেব।

ফায়সাল হেসে উঠে বলল, তা যদি পারেন, তা হলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

জেলের ঘানি টেনে যদি ধন্য হতে চান, তবে সেই ব্যবস্থাই করব বলে স্বপ্না সেখান থেকে গটগট করে চলে গেল।

ফায়সাল মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে তার চলে যাওয়া দেখল। তারপর কাজে মন দিল।

ফায়জুন্নেসা মেয়েকে ঘন্টাখানেক আগে অফিসরুমের দিকে যেতে দেখে ভেবেছিলেন, ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছে। এখন তাকে রাগান্বিত মুখে ফিরতে দেখে চিন্তা করলেন, নিশ্চয় ম্যানেজারের সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে। কাছে এলে জিজ্ঞেস করলেন, ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলি বুঝি?

স্বপ্না বলল, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

কি রকম বুঝলি?

আমারটা পরে বলছি, আগে তুমি ওনার সম্পর্কে কমেন্ট কর।

ওনার মতো ভালো ছেলে দ্বিতীয় আছে কি না জানি না। এবার তোরটা বল।

আমারটা ঠিক বিপরীত, ওনার মতো হীন চরিত্রের ছেলে আমিও দ্বিতীয় দেখি নি। ভালোর মুখোশ পরে তোমাদের সবাইয়ের মন জয় করেছে। আমি ওনার মুখোশ খুলে দিয়ে জেলের ঘানি টানাব।

ফায়জুন্নেসা মেয়ের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে বললেন, কি বলছিস তুই?

হ্যাঁ, মা, যা সত্য তাই বলছি। উনি খুব ধূর্ত ও শঠ। ধর্মের মুখোশ পরে ধার্মিক সেজে আমাদের সবকিছুর মালিক হতে চান। আমি ওনার শঠতা ধরে ফেলেছি।

ফায়জুন্নেসা বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, তুই ম্যানেজারকে বুঝতে ভুল করেছিস। তোকে আর দোষ দেব কি, প্রথম দিকে আমিও ওনাকে ভুল বুঝেছিলাম। পরে উনিই ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোর নানিকে জিজ্ঞেস করতে পারিস।

তোমার মতো নানিও ওনাকে খুব ভালো ছেলে মনে করেন। আমিও বলে রাখছি, যেমন করে হোক একদিন না একদিন ওনার মুখোশ খুলে দেবই দেব।

তুই ওনাকে কেন সন্দেহ করছিস বলতো?

পরে বলব। তবে এখন এতটুকু বলতে পারি, সবার মুখে ওনার সুখ্যাতি শুনেও মাত্র ঘণ্টা খানেক আলাপ করে তোমাদের মতো আমারও মনে হয়েছে ওনার মতো ভালো ছেলে এযুগে বিরল। আর সেটাই হল সন্দেহের কারণ।

সন্দেহটা কি বলবি তো?

বললাম না, পরে বলব? আশা করি , কিছুদিনের মধ্যে সন্দেহটা প্রমাণ করতে পারব। সবাই তখন এমনই জানতে পারবে।

তুই কি আমাদের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস জানিস?

হ্যাঁ, নানি বলেছেন। তবে আমি বিশ্বাস করি নি। তারপর নানিকে স্বপ্না যা কিছু বলেছিল সব পুনরায় বলে বলল, তোমাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে শঠতার জাল বিস্তার করেছেন স্বার্থ সাহিল করার জন্য।

ফায়জুন্নেসা চিন্তা করলেন, মেয়ের মনে যে সন্দেহ ঢুকেছে তা কোনো যুক্তিতেই দূর করা যাবে না। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মা হয়ে একটা কথা বলব, রাখবি?

বল। রাখার মতো হলে নিশ্চয় রাখব।

ম্যানেজারের শঠতা প্রমাণ করার জন্য এমন কোনো দুর্ব্যবহার ওনার সঙ্গে করবি না, যার ফলে চলে না যান।

চলে যাবেন কি করে? তোমাদের গুণ্ডাবাহিনী রয়েছে না? তুমিই তো একদিন বললে, বাইরের কেউ চৌধুরী স্টেটে চাকরি করতে এসে স্ব-ইচ্ছায় কখনও ফিরে যেতে পারে না?

তা বলেছি, তবে এটা বলি নি আমাদের গুণ্ডাবাহিনীতে যে কয়জন আছে, তারা ম্যানেজারের সঙ্গে পারবে না। তা ছাড়া তারা এখন ওনাকে পীরের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

পীরের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু আট দশজন গুণ্ডা ওনাকে আটকাতে পারবে না বুঝতে পারছি না।

উনি যে শুধু মারামারীতে পারদর্শী তা নয়, শত্রুকে আক্রমণ করার ও নিজেকে রক্ষা করার এত বেশি কলা কৌশল জানেন, যা নাকি আমাদের গুণ্ডাবাহিনীও জানে না।

তুমি এসব জানলে কি করে?

হাশেমের কাছে শুনেছি।

স্বপ্না হেসে উঠে বলল, হাশেম চাচা বলল আর তুমি বিশ্বাস করলে?

তুই তো আমাকে কথাটা শেষ করতে দিলি না। বলছি শোন, হাশেমের মুখে যখন শুনলাম, ম্যানেজার শত্রুদের গ্রামে গিয়েছিলেন এবং দশ বারজন গুণ্ডার সঙ্গে লড়াই করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম তা কি করে সম্ভব?

হাশেম বলল, আমিও বিশ্বাস করি নি। তাই ঘটনাটা সত্য কিনা জানার জন্য আমাদের গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে সুযোগ মতো একদিন হঠাৎ ম্যানেজারকে আক্রমণ করলাম। কিন্তু আমরা কেউ ওনাকে একটাও মোক্ষম আঘাত করতে পারলাম না। বরং উনিই আমাদের সবাইকে আহত করে বললেন, আপনারা আমাকে পরীক্ষা করছেন বুঝতে পেরেছি বলে বেঁচে গেলেন, নচেৎ কি করতাম আল্লাহ ভালো জানেন। আমরা ওনার কাছে মাফ চাইলাম। উনি বললেন, আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন।

এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছিস কেন কথাটা বললাম।

স্বপ্না বলল, ঠিক আছে, তোমার কথা রাখার চেষ্টা করব। তারপর নিজের রুমে এসে ভাবল, এতবড় দক্ষ ফাইটার হয়েও আসার দিন যখন তার গালে চড় মারলাম তখন তো অনায়াসে হাতটা ধরে ফেলতে পারতেন অথবা প্রতিশোধ নিতে পারতেন? তা হলে এটাও কি শঠতার মধ্যে মহত্ত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উনি তো তখন আমার পরিচয় জানতেন না? হঠাৎ তার মন বলে উঠল, তোমার মা ও নানির কাছে হয়তো তোমার কথা শুনেছে, তুমি দেখতে মায়ের মতো, তাদের কাছে তোমার আসার কথা শুনেছে, তাই অপরিচিতা হলেও তোমাকে দেখেই চিনেছে। তা ছাড়া উনি তো নিজেই বলেছেন, তোমাকে অনেক দিন আগে থেকে চেনেন। কয়েকদিন চিন্তা করে স্বপ্না একটা প্ল্যান ঠিক করল। তারপর একদিন মা ও নানিকে বলল, আমি স্টেটের সবকিছুর দায়িত্ব নিতে চাই।

লুৎফা বেগম কিছু না বলে মেয়ের দিকে তাকালেন।

ফায়জুন্নেসা মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, স্টেটের দায়িত্ব যেমন ম্যানেজারের উপর আছে তেমনি থাকবে, তুমি শুধু অবজার্ভ করবে।

কেন? আমার উপর তুমি কি ভরসা করতে পারছ না, না আমাকে দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত মনে করছ?

স্টেটের দায়িত্ব খুব কঠিন, যা পালন করা কোনো মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভেবেছি, স্টেটের সর্বময় কর্তৃত্ব তোকে দেব। তোর কথামতো স্টেটের সবকিছু চলবে। তুই যা বলবি বা যা সিদ্ধান্ত নিবি, সবাইকে সেসব মেনে নিতে হবে। এমন কি ম্যানেজারকেও। অবশ্য স্টেটের ভালো মন্দের ব্যাপারে তোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার অধিকার ম্যানেজারের থাকবে।

স্বপ্না নানিকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি কিছু বলবেন না?

লুৎফা বেগম বললেন, আমি তোর মায়ের সঙ্গে একমত। তারপর মেয়েকে বললেন, মসজিদ মাদরাসার ব্যাপারটা স্বপ্নাকে জানাও।

ফায়জুন্নেসা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছুদিন আগে ম্যানেজার আমাদের গ্রামে মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্টা করার জন্য বলেছিলেন। ইদানিং বার বার তাগিদ দিচ্ছেন। আমি মসজিদ ও মাদরাসা কিভাবে পরিচালিত হবে জিজ্ঞেস করতে বললেন, মসজিদের খরচ কম, তাই মসজিদের নামে একটা জল মহল ওয়াকফ করে দিলে সেটার আয়ে চলবে। মাদরাসার খরচ বেশি, সেজন্য বাকি চারটে জলমহল মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দিলে সেগুলোর আয়ে মাদরাসা চলবে। আর মসজিদ ও মাদরাসা পরিচালনা করার জন্য একটা কমিটি থাকবে। কমিটির সদস্যরা মসজিদ, মাদরাসা ও জলমহলের আয় ব্যায়ের হিসাব রাখবে।

স্বপ্না শুনে খুব রেগে গেল। রাগ সামলে নিয়ে বলল, তোমরা কি ম্যানেজারের কথা মেনে নিয়েছ?

হ্যাঁ, মেনে নিয়েছি।

খুব আশ্চর্য হচ্ছি, ম্যানেজার যা বলেন মেনে নাও, এর কারণ কি বলবে?

এবার লুৎফা বেগম বললেন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চৌধুরী বংশধরদেরকে জিনেদের আক্রোশ হতে রক্ষা করার জন্য।

স্বপ্না রাগের সঙ্গেই বলল, আপনাকে আগেও বলেছি আর এখনও বলছি, ওসব আগের যুগের অশিক্ষিত মানুষের মনগড়া কথা। শুধু আমি কেন, এখন কোনো শিক্ষিত মানুষ এসব বিশ্বাস করে না। মৃণালবাবুর কাছে জেনেছি, ঐ পাঁচটা জলমহল থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয়। ওয়াকফ করে দিলে আমরা ঐ টাকা থেকে বঞ্চিত হব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ম্যানেজার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জিনেদের কথা বলে মসজিদ মাদরাসা করতে চাচ্ছেন।

ফায়জুন্নেসা কিছু বলার আগে লুৎফা বেগম বললেন, আমরা ম্যানেজারকে অনেক ভাবে পরীক্ষা করে বিশ্বাস করেছি। তাই ওনার কথামতো ঐসব করতে রাজি হয়েছি। তবে ফাইন্যাল কিছু হয় নি। ফাইন্যাল হওয়ার আগে ওনাকে কেন তুই বিশ্বাস করতে পারছিস না এবং কেন ওনাকে ধূর্ত ও শঠ মনে করছি, তার প্রমাণ দেখাবি। তারপর তোকে স্টেটের সর্বময় কর্তৃত্ব দেয়া হবে।

স্বপ্না বলল, কিন্তু তার আগেই তো লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের জলমহলগুলো আপনারা ওয়াকফ করে দিচ্ছেন?

তাতে কি হয়েছে? জল মহলগুলো ছাড়াও চৌধুরী স্টেটের আয় কম না। তোর পূর্ব পুরুষরা অত্যাচার করে ভাগ চাষিদের কাছ থেকে যত না ফসল পেত, ম্যানেজার অত্যাচার না করে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তার থেকে অনেকগুন বেশি ফসল আদায় করছেন। তুইও যদি ম্যানেজারের মতো সবার সঙ্গে.ভালো ব্যবহার করিস, তা হলে আরও বেশি ফসল পাবি। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের লোকেরা চৌধুরী স্টেটের মালিকদের ভয়ে তটস্থ থাকত, আর এখন এই ম্যানেজারকে তারা পীরের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তুই যদি ম্যানেজারের পথ অনুসরণ করতে পারিস, তা হলে তোকেও সবাই ওনার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। আমার আর কিছু বলার নেই। কথা শেষ করে লুৎফা বেগম নিজের রুমে চলে গেলেন।

স্বপ্না মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিছু বলবে?

ফায়জুন্নেসা বললেন, না, তোর নানির সঙ্গে আমি একমত। তবে তোর নানি ম্যানেজারকে যতটা বিশ্বাস করে আমি ততটা করি না। কারণ আজিজকে বিশ্বাস করেছিলাম। ফলে আমাদের অনেক অর্থসম্পদ হারাতে হয়েছে। তাই আমি আর কাউকেই তেমন বিশ্বাস করি না। তবে ম্যানেজারকে কিছুটা করি। কারণ তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যা শুনে বিশ্বাস করতে হয়েছে। তাই মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা করার জন্য জলমহলগুলো ওয়াকফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সেই কথাগুলো আমাকে বলা যাবে না?

না। যা বলছি শোন, যে কারণে তুই ম্যানেজারকে সন্দেহ করিস, সেই কারণে আমার মনেও সন্দেহ জাগায়। মসজিদ মাদরাসা চালু হওয়ার পর জলমহল ওয়াকফ করা হবে। তার আগে যদি তুই সন্দেহের কারণ প্রমাণ করতে পারিস, তা হলে ওয়াকফ করব না।

মা তার দলে জেনে স্বপ্না যেমন খুশি হল তেমনি সাহসও পেল। বলল, তুমি দেখে নিও, আমি ম্যানেজারের শঠতা প্রমাণ করবই করব।

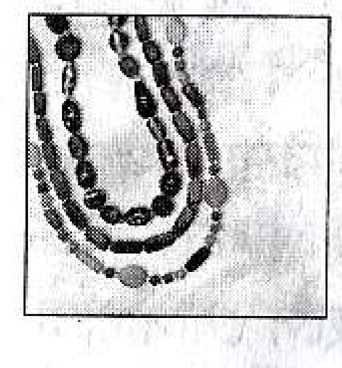

একদিন ফায়জুন্নেসা ফায়সালকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আপনি তো জানেন স্বপ্নাই চৌধুরী স্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী। ও যাতে চৌধুরী বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে সেভাবেই ওকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন। উচ্চশিক্ষা নিলেও স্টেট চালাবার মতো জ্ঞান ওর নেই। আর বয়সই বা কত হয়েছে। তা ছাড়া চৌধুরী বংশের রক্ত ওর শরীরে। ন্যায় অন্যায় কিছু করে ফেলাই স্বাভাবিক। সেজন্যে মনে কিছু না করে ওর ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেবেন। আপনি খুব বুদ্ধিমান আশা করি........

ওনাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে ফায়সাল বলল, আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কথাগুলো আমিই আপনাকে বলব ভেবেছিলাম, কাজের চাপে সময় করতে পারি নি। আজই বলতাম, তার আগে আপনি বলে ফেললেন। যাই হোক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ ব্যাপারে যা কিছু করার ইনশাআল্লাহ আমি করব। তারপর মসজিদ মাদরাসা কোথায় প্রতিষ্ঠা হবে সে ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে বিদায় নিয়ে ফায়সাল চলে এল।

ম্যানেজারের পাশের রুমে ইনসান চৌধুরী স্টেটের হিসাব পত্র চেক করতেন। উনি মারা যাওয়ার পর ওনার জামাই হারেস সেই কাজ করতেন। হারেস মারা যাওয়ার পর ফায়জুন্নেসা এতদিন করে এসেছেন। আজ থেকে স্বপ্না মায়ের কাজ করবে।

স্বপ্না এই রুমে আগে আসে নি। আজ এসে রুমের পরিবেশ দেখে খুশি হল। দরজা জানালায় ভারি পর্দা, মেঝেয় কার্পেট বিছান, গদীওয়ালা মুভিং চেয়ার, সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা খুব সুন্দর। দু'টো সেগুন কাঠের আলমারী। টেবিলের উপর একগ্লাস পানি ঢাকা রয়েছে দেখে পিপাসা অনুভব করে পানি খেয়ে গ্লাস রেখেছে, এমন সময় দরজার বাইরে থেকে ম্যানেজারের গলা শুনতে পেল, আসতে পারি?

স্বপ্না বলল, আসুন।

ফায়সাল অনেকগুলো ফাইল নিয়ে ঢুকে স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। তার মনে হল, স্বপ্নে তাকে যে পোশাকে দেখে, আজ সেই পোশাক পরেছে। তখন তার একরাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, "স্বপ্না তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আমি এলেই তুমি আমার দিকে হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাক কেন?

ফায়সাল বলেছিল, আল্লাহ তোমাকে নিখুঁত সুন্দরী করে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর এই পোশাকে তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনে হয়। তাই তোমাকে দেখলেই আমি বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।"

এখন সেই পোশাকে স্বপ্নাকে দেখে ফায়সাল বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে অপলক নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আগে হলে স্বপ্না খুব রেগে যেত; এখন রাগল না বরং মৃদু হেসে মোলায়েম স্বরে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।

ফায়সাল সম্বিত ফিরে পেয়ে ফাইলগুলো টেবিলের একপাশে রেখে বলল, আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে আপনার মা বলেছেন।

স্বপ্না বলল, সে কথা আমি জানি।

ফায়সাল বসে একটা ফাইল খুলে খোকসাবাড়ির ম্যাপ বের করে চৌধুরী স্টেটের কোথায় কি আছে দেখাতে লাগল। জমি-জায়গা, আগান-বাগান, পুকুর-ডোবা ও জলমহল দেখাতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগল। ম্যাপটা ফাইলে রেখে ফায়সাল বলল, ঐ সমস্ত জায়গায় আপনাকে সরজমিনে যেতে হবে। লোকজনদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তাদের সুবিধে অসুবিধের কথা জানতে হবে এবং অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর অন্য একটা ফাইলের দিকে হাত বাড়াল।

স্বপ্না বলল, টায়ার্ড ফিল করছি, আজ আর নয়।

তা হলে থাক, কাল শুরু করা যাবে বলে ফায়সাল উঠে দাঁড়াল।

স্বপ্না বলল, বসুন একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছা করছে।

ফায়সাল বসে বলল, বলুন।

সেদিন রাস্তায় যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আজও রুমে ঢুকে সেভাবে তাকিয়েছিলেন। সেদিন অভদ্র ভেবে রেগে গিয়ে আপনার গালে চড় মেরেছিলাম, কিন্তু আজ আপনার চোখের দৃষ্টি আমাকে রাগাতে পারে নি। বরং অন্য কিছু মনে হয়েছে। দু'দিন দু'রকম প্রতিক্রিয়া হল কেন বলতে পারেন?

পারি, তবে শোনার পর সেদিনের মতো আমার গালে চড় মারতে আপনার ইচ্ছা করবে।

সেদিনের ঘটনায় খুব অনুতপ্ত, প্লীজ ক্ষমা করে দিন।

না-না, ক্ষমা চাইছেন কেন? সে দিন উচিত কাজই করেছিলেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সেদিনের মতো অন্যায় কিছু হয়ে যাবে। তাই উত্তরটা বলতে চাচ্ছি না।

স্বপ্না মৃদু হেসে বলল, কথা দিচ্ছি, ওরকম ঘটনা আর কখনও ঘটবে না।

ফায়সাল বলল, অনেক দিন থেকে একটা মেয়ে স্বপ্নে আমার সঙ্গে অভিসার করে। সেদিন তাকে বাস্তবে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল,

রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি না তো? কথা শেষ করে স্বপ্নার মুখের দিকে তাকাল কোনো রিএ্যাকসন হয় কিনা দেখার জন্য।

স্বপ্না স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, আর আমার আজ সেদিনের ব্যতিক্রম হল কেন বলবেন না?

ফায়সালও স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হাসিমুখে বলল, কথাটা সত্য বলেন নি। সেদিনের মতো আজও রেগে গিয়ে চড় মারতে ইচ্ছা হয়েছিল আপনার। কিন্তু তা কাজে পরিণত না করে রাগ চেপে রেখে মেকি প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন আমার মুখোশ খোলার প্রমাণ জোগাড় করার জন্য।

ফায়সালের কথা শুনে স্বপ্না এত অবাক হল যে, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

ফায়সাল বলল, আর কিছু বলবেন?

আপনার ধারণা ভুল। কারণ কারো মনের কথা অন্যে জানতে পারে না।

তা ঠিক, তবে আমি সত্য কথাই বলেছি।

প্রমাণ করুন।

আপনার চোখ মুখ আমাকে জানিয়েছে। কারণ মানুষের মনের কথা চোখ মুখে ফুটে উঠে। আল্লাহ যাকে চোখ মুখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, তারা বুঝতে পারেন।

স্বপ্না বলল আচ্ছা, যে মেয়েটি স্বপ্নে অনেক দিন থেকে আপনার সঙ্গে অভিসার করছে, সেই মেয়ে যে আমি তার প্রমাণ কি? আমার মতো দেখতে অন্য কোনো মেয়েও তো হতে পারে?

হ্যাঁ, তা পারে। তবে আমি হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর সে মেয়ে আপনি।

প্রমাণ করতে পারবেন?

ইনশাআল্লাহ পারব।

করুণ তো দেখি?

ফায়সাল চোখ বন্ধ করে বলল, হোমে থাকার সময় আপনার বাম হাতের বাজুতে ফোঁড়া হয়েছিল। ডাক্তার অপারেশন করেছিলেন। অপারেশনের দাগ এখনও আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সন্ত্রাসীদের রিভলবারের গুলি আপনার ডান পায়ের গোছে বিদ্ধ হয়েছিল। ডাক্তার অপারেশন করে গুলি বার করেছিলেন। সেই দাগও এখনও আছে।

তার কথা শুনে স্বপ্না হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কারণ দু'টো ঘটনাই সত্য এবং আজও হাতে পায়ে অপারেশনের দাগ আছে।

ফায়সাল ঘটনা দু'টো বলার পরও চোখ খুলে নি। অনেকক্ষণ স্বপ্নাকে চুপ করে থাকতে দেখে চোখ খুলে দেখল, সে তার দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মৃদু হেসে বলল, কি এতেই হবে, না আরো প্রমাণ দিতে হবে?

তার কথা স্বপ্নার কানে গেল না। সে তখন ভাবছে, এসব কথা ম্যানেজার কি করে জানলেন?

ফায়সাল তার অবস্থা বুঝতে পেরে পেপার ওয়েট টেবিলে ঠুকে শব্দ করে সরিয়ে রাখল।

স্বপ্না চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এসে বলল, এসব কথা আপনি কেমন করে জানলেন?

স্বপ্নে যে মেয়েটি অভিসার করতে আসত, সেই বলেছে।

আপনি বারবার অভিসারের কথা বলছেন, তা হলে কি স্বপ্নের সেই মেয়েটিকে ভালবাসেন?

ভালবাসি মানে? এত ভালবাসি যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

এখন সে আর স্বপ্নে অভিসার করতে আসে না?

এখানে চাকরি করতে আসার পর মাত্র একবার এসেছিল। সে সময় বলেছিল, এবার আর স্বপ্নে নয়, বাস্তবে অভিসার করবে।

আপনি কি মনে করনে স্বপ্ন আর বাস্তব এক?

শুধু আমি কেন, কেউ তা মনে করে না।

তা হলে বললেন কেন, স্বপ্নের সেই মেয়েটি এবার বাস্তবে আপনার সঙ্গে অভিসার করবে?

কথাটা আমি বলি নি, বলেছিল স্বপ্নের মেয়েটি।

আপনার স্বপ্নের মেয়েটি যদি আমি হয়েও থাকি, তা হলে আপনার সঙ্গে অভিসার করছি না কেন?

এখন না করলেও কিছুদিনের মধ্যে করবেন।

আপনি ভীষণ চালাক ও বুদ্ধিমান হয়েও রাম ছাগলের মতো কথা বলতে পারলেন?

ফায়সাল হেসে ফেলে বলল, আমি তো জানি শুধু ছাগল নয়, কোনো পশু-পাখি ও জীব-জন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। রাম ছাগল কথা বলতে পারে জানা ছিল না।

স্বপ্নাও হেসে ফেলে বলল, বড় জাতের ছাগলকে রাম ছাগল বলে। লোকে বলে, "ছাগলে কি না খায় আর পাগলে কি না বলে।" তাই আপনার কথা শুনে কথাটা বলেছি।

রাম ছাগল না বলে পাগল বলা উচিত ছিল আপনার। তবে আমি যে পাগল নই, তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তাই পাগল বললেও ভুল করতেন। তারপর ঘড়ি দেখে বলল, জোহরের নামাযের সময় হয়ে গেছে, এবার আসি বলে স্বপ্না কিছু বলার আগে ফায়সাল সেখান থেকে চলে গেল।

স্বপ্না প্রেমের অভিনয় করে ফায়সালের আসল স্বরূপ উদঘাটন করার পরিকল্পনা করেছিল; কিন্তু আজ তার সঙ্গে আলাপ করার পর বুঝতে পারল, এ পথে সফলতা লাভ করতে পারবে না।

প্রতিদিন তার কাছে ফাইলপত্র ও কাজ-কর্ম বুঝে নেয়া ছাড়া অন্য কোনো আলাপ যেমন স্বপ্না করে না, তেমনি ফায়সালও করে না। দিনে স্টেটের কাজ করে। অবসর সময় মা ও নানির সঙ্গে কাটালেও রাতে ফায়সালের কথা মনে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারে না। তার স্বপ্নে দেখা মেয়েটির অভিসারের ব্যাপারটা তাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। অনেক সময় তার মনে হয়, ফায়সাল তাকে ক্যাপচার করার জন্য ঘটনাটা বানিয়ে বলেছে। পরক্ষণে মনে পড়ে তা হলে তার দু'দুটো অপারেশানের কথা জানল কি করে?

স্টেটের সবকিছু স্বপ্নাকে বুঝিয়ে দেয়ার পর ফায়সাল অফিসে থাকে না বললেই চলে। মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে। অবশ্য স্বপ্নাকে নিয়ে মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সরজমিনে যায়। সে সময় স্বপ্নার পরিচয় গ্রামবাসীদের জানায়।

স্বপ্না তাদের ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করে, সুবিধে অসুবিধে জেনে তা দূর করার আশ্বাস দেয়।

একদিন সারজমিন থেকে ফেরার সময় চৌধুরী বাড়ির গেটে তিন চারজন অচেনা লোককে দারোয়ানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে দেখে ফায়সাল দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

দারোয়ান বলল, ওরা আজিজের লোক। ভিতরে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। আপনি বাইরে গেছেন বলা সত্ত্বেও ভেতরে যেতে চাচ্ছে।

ফায়সাল লোকগুলোকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আজিজ মিয়া কার কাছে আপনাদেরকে পাঠিয়েছেন?

তাদের একজন বলল, চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজারের কাছে।

আমিই ম্যানেজার। বলুন, কেন পাঠিয়েছেন।

আপনি এই গ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবেন শুনে সে ব্যাপারে উনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তাই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ফায়সাল আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলল, উনি কেমন আছেন?

ভালো না। মাস খানেক আগে ওনার একমাত্র ছেলে সাপের কামড়ে মারা গেছেন। তারপর থেকে ওনার অবস্থা খারাপ। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন, কারো সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলেন না। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বিশেষ করে বলেছেন।

ফায়সাল বলল, মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে এল। আজ আর যাব না। আপনারা ওনাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, কাল সকাল ন'টার সময় আসব। তারপর লোকগুলোকে বিদায় করে ফিরে এসে স্বপ্নাকে নিয়ে গেটের ভিতরে ঢুকল।

স্বপ্না জিজ্ঞেস করল, আজিজের লোকগুলো কেন এসেছিল?

ফায়সাল বলল, আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আপনি কি বললেন?

বললাম, কাল সকালে যাব।

যাওয়াটা কি উচিত হবে?

নিশ্চয় উচিত হবে।

ওরা আমাদের শত্রু জেনেও যাবেন?

হ্যাঁ, যাব।

যদি আপনার ক্ষতি করে?

করলে করবে, তাতে আপনার কি? আপনার তো বরং খুশি হওয়ার কথা।

এমন কথা বলতে পারলেন?

কেন পারব না? আপনার কাছে আমি একজন শঠ ও ভণ্ড। ওরকম লোক খুন হলে সবাই খুশি হয়।

এই কয়েক মাস স্বপ্না ফায়সালের সঙ্গে মেলামেশা করে তাকে যত জানছে তত যেমন মুগ্ধ হচ্ছে তেমনি তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। তাই শত্রু আজিজের সঙ্গে দেখা করতে যাবে শুনে শঙ্কিত হয়ে একের পর এক প্রশ্ন করেছে। ফায়সালের শেষের কথা শুনে বলল, কিন্তু আপনি তো এখানকার মানুষের কাছে মহৎ।

ফায়সাল বলল, মহৎ না শঠ তা আল্লাহ ভালো জানেন। এখন আর কোনো কথা নয়, নামাযের সময় হয়ে গেছে।

আগে লুৎফা বেগম নিজের রুমে খেতেন। স্বপ্নার জিদে মেয়ে ও নাতনির সঙ্গে খেতে হচ্ছে। আজ রাতের খাওয়ার সময় স্বপ্না বলল, আজিজ তিন চারজন লোক পাঠিয়েছিল ম্যানেজারকে নিয়ে যেতে। ম্যানেজার তাদেরকে বলেছেন, কাল সকালে যাবেন।

ফায়জুন্নেসা বললেন, তুই জানলি কি করে?

তখন আমি ওনার সঙ্গে ছিলাম।

তুই ম্যানেজারকে কিছু বলেছিস না কি?

বলেছি, আজিজ আমাদের শত্রু জেনেও যাওয়ার কথা বললেন কেন? যদি আপনার ক্ষতি করে?

শুনে ম্যানেজার কি বললেন?

বললেন, "করে করবে, তবু আমি যাব।"

আর কিছু না বলে ফায়জুন্নেসা খেতে শুরু করলেন।

স্বপ্না কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বলল, ম্যানেজারের যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমাদের নিষেধ করা উচিত।

তুই করিস নি?

না।

করলেও লাভ হত না। উনি যখন যাবেন বলেছেন তখন যাবেনই।

তোমাদের কথাও শুনবেন না?

না।

স্বপ্না রেগে উঠে বলল, একজন কর্মচারী হয়ে মালিকদের কথা শুনবে না, এ কেমন কথা?

এবার লুৎফা বেগম বললেন, না শুনবেন না। কারণ আমরা আমাদের ভালো মন্দ যা বুঝি, তারচেয়ে উনি অনেক বেশি বুঝেন। তোকে তো বলেছি, আজিজ এখন আর আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে না।

স্বপ্না বলল, হঠাৎ ওনার সুমতি হল কেন?

তা বলতে পারব না। তবে মনে হয় ম্যানেজারের কারণেই হয়েছে।

আপনার এরকম মনে হল কেন?

প্রতিবছর জলমহলের মাছ ধরার সময় আজিজের লোকজন হামলা করে। এ বছর মাছ ধরার আগের দিন ম্যানেজারকে সে কথা জানাতে বললেন, আজিজ আর আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না। তার কথার প্রমাণ পেয়ে মনে হয়েছে। ম্যানেজারকে আজিজ ডেকে পাঠিয়েছে জেনে মনে হচ্ছে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলাপ করবে।

তারপর আর কেউ কোনো কথা না বলে খাওয়া শেষ হতে লুৎফা বেগম রুমে চলে গেলেন।

ফায়জুন্নেসা মেয়েকে নিয়ে নিজের রুমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ম্যানেজারের ব্যাপারে কোনো ক্লু পেয়েছিস?

স্বপ্না বলল না, পাই নি। খুব আশ্চর্য হই, যে কোনো বিষয়কে টার্গেট করে যখন ওনার শঠতা ধরার চেষ্টা করি তখন উনি সেটার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করেন, যা আমি চিন্তাই করতে পারি নি। আর একটা ব্যাপারেও খুব আশ্চর্য হই, আমি তার সঙ্গে কি আলাপ করব না করব, তা উনি আগের থেকে জানতে পারেন। এটা কি করে সম্ভব মাথায় ঢুকছে না। এ ব্যাপারে তুমি কিছু বলতে পার?

ফায়জুন্নেসা অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বলব কি? আমার ও তোর নানির মাথায়ও এ ব্যাপারটা ঢোকে নি। তোর নানি তো একদিন ম্যানেজারকে

বলেই ফেললেন, তুমি মানুষ না অন্য কিছু? তখন ম্যানেজার তোর নানির পায়ে হাত দিয়ে বললেন, "এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি মানুষ?"

স্বপ্না বলল, মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় উনি মানুষ নয়, অন্য কিছু।

ফায়জুন্নেসা বললেন, তোকে যে লোক পাঠিয়ে ওনার ঢাকার বাড়ির খোঁজ-খবর নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিস?

হ্যাঁ, নিয়েছি। ওনার মা-বাবা বা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন নেই। দূর সম্পর্কের এক ফুপু-ওনাকে মানুষ করেছেন। ফুপুর স্বামী বা ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একটা পুরানো তিন কামরা বাড়িতে থাকেন। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল। বয়স ষাটের উপর। একটা বয়স্ক কাজের মেয়ে ও একটা কাজের লোক ওনার কাছে থাকে।

তুই প্রেমের অভিনয় করে ওর সবকিছু জানার চেষ্টা করতে পারিস।

সে চেষ্টা করি নি মনে করেছ? বুঝতে পেরে এমন একটা ঘটনা শোনালেন, যা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

কি ঘটনা বলতো শুনি।

স্বপ্না ম্যানেজারের স্বপ্নে দেখা মেয়েটার ঘটনা বলে বলল, আমি যে সেই মেয়ে তা প্রমাণ করতে বললাম। ম্যানেজার আমার হাতের ও পায়ের দু'টো অপারেশনের কথা ও অপারেশনের দাগ যে এখনও আছে তাও বললেন।

হাতে পায়ে তোর অপারেশন হয়েছিল কেন?

স্বপ্না সে কথা বলে বলল, ম্যানেজার আরও বললেন, স্বপ্নে আমি নাকি ওনাকে অপারেশনের দাগ দু'টো দেখিয়েছি। সব থেকে বেশি আশ্চর্য হলাম যখন বললেন, সেই মেয়েকে তিনি নিজের থেকে বেশি ভালবাসেন। মেয়েটিও তাকে ভীষণ ভালবাসে এবং স্বপ্নে মাঝে মাঝে ওনার সঙ্গে অভিসারে আসেন।

শুনে তুই কিছু বলিস নি?

বলি নি আবার? বললাম, আমি যদি আপনার স্বপ্নে দেখা সেই মেয়ে হই, তা হলে বাস্তবে আমি আপনাকে ভালবাসি না কেন? আর অভিসারই বা করছি না কেন? বললেন, খুব শিঘ্রি আপনি আমাকে ভালবাসবেন এবং আমার সঙ্গে অভিসারও করবেন।

তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কোনো রূপকথার গল্প শুনছি।

আমার কিন্তু তা মনে হয় নি। মনে হয়েছে, স্বপ্নের ঘটনা শুনিয়ে আমাকে সহ আমাদের সবকিছুর মালিক হতে চান।

এখন কি সে ধারণা পাল্টে গেছে?

না, পাল্টায় নি। তবে ওনার চরিত্রের দৃঢ়তা ও মাধুর্য ধারণায় ফাটল ধরাতে শুরু করেছে। যত সহজে ওনার মুখোশ খুলতে পারব ভেবেছিলাম, তা সম্ভব নয়। কোনো দিন পারব কি না তাও বলতে পারছি না। ওনার আসল স্বরূপ

জানার জন্য যে পথেই অগ্রসর হই, সেই পথেই উনি প্রাচীর তুলে দেন, তাই ক্রমশ ওনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

মেয়ের অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে ফায়জুন্নেসা বললেন, এতে চিন্তা করার কি আছে? তোর মা হয়ে আমিই যখন ওনার স্বরূপ জানতে পারি নি, তখন তুইও যে পারবি না তা জানতাম। তাই অনেক ভেবে চিন্তে তোর নানির সঙ্গে আলাপ করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্তটা তুই কি মেনে নিতে পারবি?

সিদ্ধান্তটা আগে শুনি, তারপর বলব।

আমরা ম্যানেজারকে জামাই করতে চাই।

যেদিন ম্যানেজার স্বপ্নের মেয়েটির কথা বলে সেদিন স্বপ্না খুব রেগে গিয়ে ভেবেছিল, তাকে ক্যাপচার করার জন্য মিথ্যের জাল বিছিয়ে ফাঁদে ফেলতে চান। কিন্তু মেলামেশা করে যত ওনাকে জানছে তত নিজেই সেই ফাঁদে পড়ার জন্য তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। মায়ের কথা শুনে সেই অস্থিরতা আরো হাজারগুণ বেড়ে গেল। তাই মনকে শান্ত করার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে ফায়জুন্নেসা বললেন, এক্ষুনি মতামত জানাবার দরকার নেই, ভেবে চিন্তে জানাস। তবে একথাও ঠিক, তোর অমতে আমরা কিছু করব না। এবার ঘুমোতে যা।

পরের দিন সন্ধ্যের পর ফায়জুন্নেসা ফায়সালকে ডেকে পাঠালেন।

ফায়সাল দোতলা ড্রইংরুমে ঢুকে সালাম দিয়ে দেখল, ফায়জুন্নেসা, লুৎফা বেগম ও স্বপ্না রয়েছেন।

স্বপ্না সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বলল।

ফায়সাল বসার পর লুৎফা বেগম বললেন, স্বপ্নার কাছে শুনলাম কাল আজিজের লোক তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। আজ সকালে যাবে তাদেরকে বলেছিলে, গিয়েছিলে নিশ্চয়?

জি, গিয়েছিলাম।

কেন ডেকেছিল।

আপনারা মাদরাসা করবেন শুনে আলাপ করার জন্য।

কি আলাপ করলেন?

উনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার কাজে বেশ কিছু টাকা দিতে চান আর মাদরাসার গরিব ছাত্রদের জন্য এতিমখানা করার জন্যও টাকা দিতে চান। শুধু তাই নয়, মাদরাসা ও এতিমখানা যাতে বন্ধ হয়ে না যায়, সেজন্য বেশ কিছু জমিও ওয়াকফ করে দেবেন বললেন।

মা কিছু বলার আগে ফায়জুন্নেসা রেগে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, পরের ধনে পোদ্দারী করে সওয়াব কামাতে চায়। আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব,

আপনি তো কুরআন হাদিসের অনেক জ্ঞান রাখেন, অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ এরকম কাজে দান করলে কি সওয়াব পাওয়া যায়?

লুৎফা বেগম মেয়েকে ধমকের সুরে বললেন, সব জানার পরে জিজ্ঞেস করিস, ওকে কথা শেষ করতে দে। তারপর ম্যানেজারকে বললেন, আজিজের কথা শুনে তুমি কি বললে?

বললাম, শুনেছি আপনার আর্থিক অবস্থা আগে খুব খারাপ ছিল। চৌধুরী স্টেটে ম্যানেজারী করার সময় স্টেটের তহবিল তসরুফ করে ও কৌশলে স্টেটের অনেক জমি-জায়গা নিজের নামে করে নিয়ে বড়লোক হয়েছেন। আপনি মনে হয় জানেন না, এসব কাজে অসৎ পথে উপার্জিত সম্পদ দান করতে নেই। করলেও তার কোনো সওয়াব আল্লাহ দেন না। তাই জেনেশুনে ঐ সম্পদ এরকম কাজে গ্রহণ করতে আমি পারব না।

আগে হলে আমার কথা শুনে হয়তো আমাকে খুন করে ফেলতেন, কিন্তু এখন উনি একরকম মৃত্যুশয্যায়। তারপর ওনার ছেলের মৃত্যুর কথা বলে বলল, তাই একটু গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এসব কথা জানলেন কি করে? বললাম, যেমন করে জানি না কেন, কথাগুলো যে সত্য, অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ এই গ্রামের মুরুব্বীরা সবাই ব্যাপারটা জানেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, হ্যাঁ, আপনার সব কথা সত্য। এখন আমি আমার পাপের জন্য অনুতপ্ত। তাই যা কিছু অসৎ পথে উপার্জন করেছি সব মাদরাসায় দান করতে চেয়েছিলাম। আপনিই বলুন, কিভাবে আমি পাপের প্রায়শ্চিত্য করব? কি করলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন? তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, বেশ কিছুদিন আগে আমাদের মসজিদে দরবেশের মতো একজন মুসাফির এসেছিলেন। তিনি এমন কিছু কথা আমাকে বলেছিলেন, যা শুনে আমার দিব্যচোখ খুলে যায়, দুষ্কর্মের জন্য মনে অনুশোচনা জাগে এবং মনে মনে সংকল্প করি, প্রায়শ্চিত্য করার। উনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আরো বললেন, মানুষ জীবনে ন্যায় অন্যায় অনেক করে। সে জন্যে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। তিনি চলে যাওয়ার আগের দিন আপনার অনেক সুনাম করে আমাকে বলেছিলেন, আপনি একটা মাদরাসা করবেন, আমি যেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

বললাম, আল্লাহ দয়ার সাগর, "যে বান্দা অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায়, তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন।" এটা কুরআন হাদিসের কথা। আপনি যখন অনুতপ্ত তখন নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তবে আমি হাদিস মোতাবেক যে কথা বলব, তা আপনাকে করতে হবে।

আমার কথা শুনে আজিজ মিয়া যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললেন, বলুন কি করতে হবে? আপনি যা বলবেন তাই করব।

বললাম, অসৎ পথে চৌধুরী স্টেটের যত যা কিছু নিয়েছেন, সেসব স্টেটের মালিকের কাছে ফেরৎ দিতে হবে অথবা স্টেটের মালিকের কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে এবং উনি যদি আন্তরিকভাবে ক্ষমা করে দেন, তা হলে যা কিছু আপনি মাদরাসায় দান করতে চাচ্ছেন তা আমি গ্রহণ করব। আর সে জন্য আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন ও সওয়াব দান করবেন।

উনি আবার চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনার কথায় আমি রাজি। আমার শারীরিক অবস্থা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, চৌধুরী স্টেটের মালিকের কাছে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। কি করব আপনি আমাকে পরামর্শ দিন।

বললাম, ঠিক আছে, আপনার কথা আমি স্টেটের মালিকের কাছে বলব, উনি কি বলেন না বলেন আপনাকে জানাব। তারপর বিদায় নিয়ে চলে আসি।

ফায়সাল চুপ করে গেলে লুৎফা বেগম নাতনিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন তুমিই চৌধুরী স্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী, আজিজের ব্যাপারে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

স্বপ্না কিছুক্ষণ চিন্তা করে নানিকে বলল, আপনি মালিক হলে কি করতেন?

লুৎফা বেগম বললেন, অপরাধী অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা উচিত। বিশেষ করে অপরাধী যখন মৃত্যু পথের যাত্রি হয়।

স্বপ্না মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মতামত বল।

ফায়জুন্নেসার কানে মা ও মেয়ের কথা যায় নি। তিনি ম্যানেজারের মুখে আজিজের কথা শোনার পর থেকে চিন্তা করছিলেন, কে সেই মুসাফির? যে নাকি আজিজের মতো পাপীর দিব্যচোখ খুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন? তিনি কি আমার ও আজিজের কীর্তিকলাপ জানেন? আরো চিন্তা করছিলেন, আজিজ কি তার ও আমার সম্পর্কের কথা এবং আমি তাকে দিয়ে যা কিছু করিয়েছি, সে সব ম্যানেজারকে বলেছে?

মাকে এতক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে দেখে স্বপ্না একটু বড় গলায় বলল, মা, কি এত চিন্তা করছ? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

মেয়ের বড় গলায় ফায়জুন্নেসা সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, কি জানতে চাচ্ছিস?

নানি আজিজকে ক্ষমা করার কথা বললেন, তোমার মতামত জানতে চাচ্ছি।

তোর নানির সঙ্গে একমত বলে ফায়জুন্নেসা ফায়সালকে জিজ্ঞেস করলেন, যে মুসাফিরের কথা শুনে আজিজের দিব্যচোখ খুলে গেছে, সেই মুসাফিরকে আপনি চেনেন?

ফায়সাল বলল, জি না, চিনি না।

তা হলে তিনি আজিজের কাছে আপনার সুনাম গাইল কি করে? তা ছাড়া আপনার মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কথাই বা জানলেন কি করে?

যে মসজিদে জুম্মার নামায পড়তে যায়, বেশ কিছুদিন আগে সেই মসজিদে দরবেশী পোশাকে অপরিচিত একজন মুরুব্বীকে দেখে কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলাম। সে সময় উনি আমার পরিচয় ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে জেনে অনেক দো'য়া করেছিলেন। তবে উনিই যে সেই মুসাফির তা বলতে পারব না। তারপর স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে ফায়সাল বলল, আজিজকে ক্ষমা করার ব্যাপারে এবার আপনার মতামত বলুন।

স্বপ্না বলল, আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?

ফায়সাল চিন্তাই করে নি, স্বপ্না তাকে এরকম প্রশ্ন করবে। তাই থতমত খেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল, দেখুন, আমি আপনাদের একজন কর্মচারী, আমার মতামত একেবারে মূল্যহীন।

স্বপ্না বলল, মূল্যহীন হোক অথবা মূল্যবান হোক, আপনি বলুন।

ফায়সাল বলল, হাদিসে পড়েছি, " আমাদের নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, আমি যদি বড় শপথকারী হইতাম, তবে আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করিতামঃ দানে ধন কমে না; যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে কোনো অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, আল্লাহ তাহার বিনিময়ে বিচারের দিন তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিবেন এবং যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তাহার জন্য দারিদ্রতার দ্বার উন্মুক্ত করনে।"[১] তবে এ কথা শরীয়ত সম্মত যে, অত্যাচারী যদি বারবার অত্যাচার চালিয়ে যায়, তা হলে তার প্রতিকার করা উচিত। এবার আপনি বলুন কি করবেন। আপনার মতামত জানার পর আজিজের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

স্বপ্না বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) এর সন্তুষ্টির জন্য আমিও তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

ফায়সাল আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলল, এরকমই আপনার কাছে আশা করেছিলাম। তারপর বিদায় নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

পরের দিন ফায়সাল আজিজের বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা পাওয়ার কথা জানাল।

আজিজ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে বেশি দিন বাঁচব না। তাই দু'একদিনের মধ্যে চৌধুরীদের যা কিছু অসৎ পথে নিয়েছিলাম, সবকিছু মাদরাসায় ওয়াকফ করে দেব। আমার একটা নাতি আছে, আপনি দো'য়া করবেন, আল্লাহ যেন তাকে হায়াতে তৈয়েবা দান করেন।

ফায়সাল বলল, দো'য়া তো করবই, তা ছাড়া সে যাতে আলেম হয়, সে চেষ্টাও করব।

(১) বর্ণনায় : হযরত আবু কাবশাহ (রাঃ) – তিরমিযী।

আজিজ বললেন, আল্লাহ আপনাকে খোকসাবাড়ির জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। আপনি কয়েকদিনের মধ্যে আসবেন। আরো কিছু কথা আপনাকে বলার আছে।

ফায়সাল বলল, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আসব। তারপর বিদায় নিয়ে ফায়সাল চলে এল।

কয়েকদিন পর ফায়সাল আবার যে দিন গেল তার পরের দিন আজিজ মারা গেল।

মাস তিনেকের মধ্যে মসজিদ তৈরি সম্পূর্ণ হলেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে চালু করতে প্রায় এক বছর সময় লাগল। আজ মাদরাসা উদ্বোধন হবে। ধর্মমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। এই দু' বছরের মধ্যে খোকসাবাড়ি ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামে ফায়সালের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। আবাল বৃদ্ধ তাকে শ্রেণীমতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাকে খোকসাবাড়ির আল্লাহর রহমত মনে করে। বিশেষ করে গরিবরা তাকে পীরের মতো মান্য করে। আর করবে নাই বা কেন? যে সব অসহায় পরিবারের আয়ের কোনো উৎস নেই, তাদের আয়ের উৎস করে দিয়েছে, অসহায় পরিবারের অনেক আইবুড়ী মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে, বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা ঘাটের সংস্কার করে দিয়েছে। গরিব ও অসহায় পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সব থেকে বড় যে কাজ করেছে সেটা হল, চৌধুরীদের অত্যাচার থেকে সমস্ত গ্রামের মানুষকে রক্ষা করেছে। অবশ্য ফায়সালের সঙ্গে স্বপ্নারও সুনাম ছড়িয়েছে। কারণ ফায়সাল যা কিছু করেছে স্বপ্নাকে দিয়ে করিয়েছে, সে শুধু সঙ্গে থেকেছে আর লোকজনের কাছে স্বপ্নার পরিচয় জানিয়েছে। তার ফলে চৌধুরী বংশের আগে যে দুর্নাম ছিল এখন আর তা নেই। বরং ক্রমশ সুনাম বেড়েই চলেছে।

তাই আজ মাদরাসা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ এসেছে। চৌধুরী স্টেটের সব লোক এসেছে। লুৎফা বেগম বোরখা পরে এলেও ফায়জুন্নেসা ও স্বপ্না গায়ে মাথায় চাদর দিয়ে এসেছেন।

নীলফামারী জেলার এম.পি. আসার পর ধর্মমন্ত্রী মাদরাসা উদ্বোধন করলেন। তারপর অনুষ্ঠানে ভাষণ দেয়ার সময় প্রথমে ফায়সালের ও চৌধুরী স্টেটের মালিকদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর যারা এই প্রতিষ্ঠানে জমি-জায়গা ও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে তাদের, বিশেষ করে আজিজের অনেক প্রশংসা করে বললেন, আশা করি, যারা এই মহৎ প্রতিষ্ঠান করেছেন এবং যারা সাহায্য করেছেন, তারা সবাই এটা যাতে ভালোভাবে পরিচালিত হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই প্রতিষ্ঠান যাতে সরকারের অনুদান পায়, সে ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ আমি করব। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ তারপর সালাম জানিয়ে বসে পড়লেন।

এমন সময় একটা জীপ এসে মঞ্চের কাছে থামতে সেদিকে সবাই তাকাল। জীপ থেকে ডি.আই.জি, আই.জি ও খোকসাবাড়ি থানার ওসি নেমে মঞ্চে এসে ধর্ম মন্ত্রীর সঙ্গে সালাম ও মোফাসা করার পর উনি ওনাদের বসতে বললেন। আর ওনাদের সঙ্গে যে কয়েকজন পুলিশ এসেছে, তারা মন্ত্রীকে স্যালুট দিয়ে একপাশে দাঁড়াল।

ওসি সাহেব বসেন নি, দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওনারা বসার পর ওসি সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা চৌধুরী বংশের কিংবদন্তীর কথা অনেক শুনেছেন। তিন বছর আগে এখানকার থানার ওসি হয়ে আসার পর আমিও শুনেছি; কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। প্রায় দু'বছর থানার নথীপত্র দেখে ও আপনাদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করে দৃঢ় ধারণা হয়, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রথমে ডি.আই.জি. কে সবকিছু জানিয়ে নতুন করে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করি। উনি ফাইল পত্র আই.জি. সাহেবের কাছে পাঠান। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের একজনকে তদন্ত করার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর মঞ্চে দাঁড়ান ফায়সালের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে তুলে বললেন, ইনিই তিনি, যিনি দু'বছর আগে চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজার হয়ে কাজ করছেন। ইনি এই দু'বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে একদিকে যেমন চৌধুরী বংশের দুর্নাম ঘুচিয়ে সুনাম অর্জনের কাজ করছেন, তেমনি চৌধুরী বংশের ব্যাপারে যে কিংবদন্তী আছে, তার রহস্য উদঘাটন করেছেন। এখন আমরা ওনার মুখ থেকে রহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনী শুনব। মন্ত্রী মহোদয়, আই.জি. ও ডি.আই. জি. সাহেবের কাছে সবিনয় নিবেদন করছি, আপনারা জনাব ফায়সালকে সব কিছু বলার জন্য অনুমতি দিন।

ওনারা অনুমতি দেয়ার পর ফায়সাল বলল, ওসি সাহেবের পাঠান ফাইলপত্র পড়ে আমিও কিংবদন্তী কথাগুলো বিশ্বাস করি নি। এর মধ্যে পেপারে চৌধুরী স্টেটের ম্যানেজারের জন্য লোক চায় জেনে এখানে এসে চাকরিতে জয়েন করি। আসার পথে নীলফামারী স্টেশনে নেমে এক বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করে

চৌধুরী বংশের অনেক কিছু জানতে পারি। পরে সেই বৃদ্ধের অনেক খোঁজ করেও আর দেখা পাই নি। তারপর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে ছুটি নিয়ে প্রথমে চৌধুরী বংশের প্রথম পূর্ব পুরুষ জয়নুদ্দিনের আসল বাড়ি ডোমারে অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারি, জয়নুদ্দিন দীঘিতে মাছ ধরতে গিয়ে জিনেদের একঘড়া সোনার মোহর পেয়ে লোক জানা-জানির ভয়ে এখানে পালিয়ে এসে বাস করেছেন, কথাটা মিথ্যা। আসল কথা হল, উনি যখন দীঘিতে মাছ ধরতে যান তার আগে ডাকাতরা ডাকাতি করে এসে টাকা ও সোনার গহনা ভাগাভাগি করছিল। পুলিশরা গোপন সূত্রে সেকথা জানতে পেরে তাদেরকে এ্যারেস্ট করতে আসেন। তখন তারা টাকা ও সোনার গহনা একটা পিতলের কলসে ভরে শক্ত কাদা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দীঘির পানিতে ফেলে দেয়। পুলিশরা ততক্ষণে ঘেরাও করে সবাইকে এ্যারেস্ট করে এবং তাদের সাত বছরের জেল হয়। জয়নুদ্দিনের জালে সেই পিতলের কলসি উঠে আসে। তবে একথা ঠিক, লোক জানাজানির ভয়ে জয়নুদ্দিন গোপনে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন।

ঐ ডাকাত দলে সামশের নামে একজন ছিলেন। তিনি হলেন পাশের গ্রামের আজিজ মিয়ার পরদাদা অর্থাৎ দাদার বাবা। জেলে সামশেরের আচরণ ভালো হওয়ায় মেয়াদ শেষ হওয়ার দু'বছর আগে ছাড়া পান। তারপর সেই দীঘিতে যেখানে টাকা ও গহনার কলস ফেলেছিল, সেখানে কয়েকদিন গভীর রাত্রে জাল ফেলে নিরাশ হয়ে ডোমার গ্রামে খোঁজ করতে লাগলেন, হঠাৎ কেউ বড়লোক হয়েছে কিনা। একদিন একজন লোকের কাছে জানতে পারলেন, বছর চারেক আগে হত-দরিদ্র জয়নুদ্দিন স্ত্রী ও একছেলেকে নিয়ে খোকসাবাড়িতে গিয়ে খুব বড়লোক হয়ে চৌধুরী উপাধি নিয়ে বাস করছেন। কথাটা জেনে সামশেরের দৃঢ় ধারণা হল, এই জয়নুদ্দিনই নিশ্চয় টাকা ও গহনার কলস পেয়েছে। বাড়িতে ফিরে এসে একদিন জয়নুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন ওনার হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে এখানে আসার ও হত-দরিদ্র হয়ে কি করে এত বড় লোক হলেন।

জয়নুদ্দিন তখন গ্রামের প্রভাবশালী লোক। সামশেরকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

সামশের লোক পরম্পরায় জানতে পারলেন, জয়নুদ্দিন জিনেদের একঘড়া সোনার মহর পেয়ে এখানে এসে বসবাস করছেন। তখন ওনার ধারণাটা আরও দৃঢ় হল। জয়নুদ্দিন আসল কথা চেপে গিয়ে জিনেদের সোনার মহরের ঘড়ার কথা বলেছেন। তারপর শুরু করলেন শত্রুতা। সময় সুযোগ মতো জয়নুদ্দিনের গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে জলমহলে ফেলে দেন। এর কিছুদিন পর সামশের মারা যান। মারা যাওয়ার আগে ছেলে সারওয়ারকে জয়নুদ্দিনের কাহিনী বলে যান। সারওয়ার সময় সুযোগ মতো জয়নুদ্দিনের ছেলে আবসার উদ্দিনকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে একই জলমহলে ফেলে দেন। সারওয়ার মারা যাওয়ার আগে

ছেলে সোরাব উদ্দিনকে সবকিছু বলে ইনসান চৌধুরীকে একইভাবে হত্যা করার কথা বলে যান। কিন্তু তা করার আগে হঠাৎ সোরাব উদ্দিন মারা যান। তখন ওনার ছেলে আজিজ ক্লাস টেনে পড়ে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ইনসান চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে ফায়জুন্নেসার সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া হয়। কলেজে পড়ার সময় আজিজ দাদিকে কথাটা জানিয়ে বলেন, বি.এ. পাশ করে আমি ফায়জুন্নেসাকে বিয়ে করব।

নাতির কথা শুনে দাদি আয়শা খাতুন চিন্তা করলেন, সোরাব উদ্দিন যে কাজ করতে পারে নি, আজিজকে দিয়ে তা করাতে হবে। বললেন, তোর কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তারপর চৌধুরীদের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের শত্রুতার কারণগুলো বলে বললেন, ইনসান চৌধুরী হল বিশাল হাঙ্গর মাছের মতো আর আমরা হলাম চুনো পুঁটি মাছের মতো। উনি মেয়েকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবেন তবু তোর সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। তাই বি.এ. পাশ করার পর তোর প্রথম কাজ হবে ইনসান চৌধুরীকে তার বাপ-দাদার মতো হত্যা করে জলমহলে ফেলে দেয়া। তারপর ঐ মেয়েকে বিয়ে করে তুই চৌধুরী স্টেটের মালিক হবি। দাদির কথা মতো আজিজ বি.এ. পাশ করার পর ইনসান চৌধুরীকে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। এদিকে ইনসান চৌধুরী তার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কের কথা জেনে স্টেটের ম্যানেজার হারেসের সঙ্গে ফায়জুন্নেসার বিয়ে দেন। আজিজ সে কথা জেনে শ্বশুর জামাই দু'জনকেই হত্যা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর সুযোগ পেয়ে প্রথমে ইনসান চৌধুরীকে পূর্বপুরুষদের মতো একই কায়দায় হত্যা করে জলমহলে লাশ ফেলে দিলেন। এটাকেও সবাই জিনেদের দুশমনী ভাবলেন। এমন কি থানার পুলিশরাও তাই ভেবেছিলেন। তারপর কৌশলে ইনসান চৌধুরীর জামাইকেও একই পন্থায় হত্যা করে এবং কৌশলে ফায়জুন্নেসার মন জয় করে স্টেটের ম্যানেজার হন। ম্যানেজার হওয়ার পর স্টেটের আয় থেকে টাকা মেরে অনেক জমি-জায়গা করে ধনী হয়ে যান। তারপর ফায়জুন্নেসাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ততদিনে আজিজের ধনী হওয়ার কথা ফায়জুন্নেসা শুনেছেন এবং স্টেটের আয় ব্যয়ের হিসাবে অনেক কারচুপি জানতে পারেন। তাই বিয়ের প্রস্তাব শুনে ফায়জুন্নেসা আজিজের মতলব বুঝতে পারেন এবং ওনাকে যা তা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। তারপর থেকে আজিজ তার গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে চৌধুরী স্টেটের ক্ষতি করেই চললেন।

ওসি ফায়সালকে জিজ্ঞেস করলেন, এতকিছু জেনেও আজিজকে আগেই এ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করলেন না কেন?

ফায়সাল বলল, আজিজ ও ওনার পূর্ব পুরুষরা যে একের পর এক চৌধুরী স্টেটের মালিকদের হত্যা করেছেন, তা আগে জানতে পারি নি।

তারপর চৌধুরীদের টাকা আত্মসাৎ করে যে সব সম্পত্তি করেছিলেন, সেগুলো মাদরাসায় কিভাবে ওয়াকফ করলেন সে সব বলে বললেন, মৃত্যু শয্যায় উনি আমাকে এসব কথা বলেছেন।

এবার আই.জি. সাহেব ফায়সালকে বললেন, এই জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, অতি শিঘ্রি ঢাকা অফিসে জয়েন করবেন।

ফায়সাল বলল, জি, করব।

ধর্ম মন্ত্রী ফায়সালের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, আমি জেনেছি, আপনি সরকারি কাজে এসে এই দু'বছরের মধ্যে খোকসাবাড়ি থানার সমস্ত গ্রামের মানুষকে উন্নতির পথ দেখিয়েছেন, চৌধুরীদের শত্রুকে মিত্র করেছেন এবং জিনেদের দুশমনী করার যে ধারণা করে চৌধুরীরা এতকাল আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ছিলেন, তা দূর করে কিংবদন্তীর অবসান ঘটালেন। সে জন্য সরকার থেকে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। তারপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

ফায়সালের আসল পরিচয় জেনে ও তার বক্তব্য শুনে ফায়জুন্নেসা প্রথম দিকে যেমন খুশি হয়েছিলেন তেমনি অবাকও হয়েছিলেন। কিন্তু ফায়সাল যখন আজিজের সঙ্গে তার মন দেয়া-নেয়ার কথা বলে তখন একথা ভেবে ভয় পেয়েছিলেন যে, স্বামী বেঁচে থাকা অবস্থায় ও মারা যাওয়ার পর আজিজের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা যদি প্রকাশ করে দেন, তা হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। কথাটা ভেবে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ফায়সাল কৌশলে ঐ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ফায়সাল মানুষ হলেও তার চরিত্র ফেরেশতার মতো।

লুৎফা বেগমও খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, যদি ফায়সাল ওদের অবৈধ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে দেয়, তা হলে চৌধুরী বংশের ইজ্জৎ ধুলোয় মিশে যাবে। ফায়সাল তা করল না দেখে তিনিও তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হলেন।

আর স্বপ্না ফায়সালের পরিচয় পেয়ে যতটুকু খুশি হয়েছিল, পূর্ব পুরুষ জয়নুদ্দিনের ধনী হওয়ার ঘটনা শুনে তার থেকে অনেক বেশি নিজের কাছে নিজেকে ঘৃণিত মনে করতে লাগল। ভাবল, চৌধুরীদের এত বিশাল সম্পত্তির পিছনে রয়েছে ডাকাতদের ডাকাতির অবৈধ সম্পদ।

বাড়িতে এসে মেয়ের মন খারাপ দেখে ফায়জুন্নেসা জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, শরীর খারাপ?

স্বপ্না বলল, না।

তা হলে তোর মন খারাপ কেন?

পূর্ব পুরুষ জয়নুদ্দিনের ধনী হওয়ার ঘটনা শুনে।

এতে মন খারাপের কি হল? আমরা তো অন্যায় কিছু করি নি?

না করলেও আমরা ওনার সেই অন্যায়ভাবে হস্তগত সবকিছু তো ভোগ করছি?

হ্যাঁ, তা করছি। তবে এজন্য তো আমরা দায়ী নই। ওসব কথা মন থেকে মুছে ফেলে এখন কি করবি চিন্তা কর।

স্বপ্না অবাক হয়ে বলল, কি চিন্তা করব?

এরই মধ্যে ভুলে গেলি? ম্যানেজারকে জামাই করার ব্যাপারে সেদিন আমাদের সিদ্ধান্তের কথা তোকে বললাম না?

উনি সরকারি লোক, সরকারি কাজে এসেছিলেন। কাজ শেষ হয়েছে, ওনার বস এবার ঢাকায় ফিরে যেতে বললেন, শুনলে না।

তা তো শুনেছি। এর সঙ্গে বিয়ের কোনো সম্পর্ক থাকবে কেন?

সম্পর্ক নেই ঠিক; কিন্তু আমাকে বিয়ে করবেন কি না তাতো তোমরা জান না? প্রস্তাব দিলে যদি রাজি না হন?

কেন হবেন না? তুই তো বলেছিলি, "তিনি তোকে ভীষণ ভালবাসেন, তোকে না পেলে সারাজীবন বিয়েই করবেন না।"

আমাকে নয়, উনি ওনার স্বপ্নে দেখা মেয়েটির কথা বলেছিলেন।

ওনার স্বপ্নে দেখা মেয়েটি যে তুই, সে কথাও তো বলেছিলি। আমি তোর নানিকে দিয়ে প্রস্তাব দেওয়াব।

দু'বছর তার সঙ্গে মেলামেশা করে স্বপ্না ফায়সালকে এত ভালবেসে ফেলেছে যে, তার কেবলই মনে হয় তাকে ছাড়া বাঁচবে না। তাই সে এবার চলে যাবে, জানার পর থেকে তার মন ভীষণ ছটফট করছে। প্রস্তাব দেয়ার কথা শুনে ভাবল, পূর্বপুরুষ জয়নুদ্দিনের কারণে হয়তো ফায়সাল তাকে ভীষণ ভালবাসলেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে না। কথাটা ভেবে তার চোখে পানি এসে যেতে মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

কি রে, কিছু বলছিস না কেন?

ভিজে গলায় জানি না যাও বলে স্বপ্না সেখান থেকে নিজের রুমে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রাতে খাওয়ার টেবিলে লুৎফা বেগম মেয়েকে বললেন, স্বপ্না কোথায়? ওকে ডাক।

ফায়জুন্নেসা কুলসুমকে বললেন, স্বপ্না আসে নি কেন দেখে এস।

কুলসুম ফিরে এসে বলল, আপা দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়েছেন, ডাকতে বললেন, খাবেন না।

লুৎফা বেগম মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর শরীর খারাপ নাকি?

ফায়জুন্নেসা মেয়ের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। বললেন, না, তবে মন খুব খারাপ দেখলাম।

হঠাৎ মন খারাপ কেন হল?

মনে হয়, ম্যানেজার ঢাকা চলে যাবেন শুনে মন খারাপ, তারপর তার সঙ্গে যা আলাপ করেছেন বললেন।

লুৎফা বেগম কিছু না বলে খাওয়া শেষ করে রুমে যাওয়ার সময় বললেন, ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাও তার সঙ্গে কথা বলব।

ফায়সাল দো'তলায় ড্রইংরুমে এসে সালাম দিয়ে ঢুকে দেখল, লুৎফা বেগম ও ফায়জুন্নেসা বসে আছেন, স্বপ্না নেই।

ফায়জুন্নেসা সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বললেন।

ফায়সাল বসার পর লুৎফা বেগম বললেন, সরকারি কাজে এসেছিলে, কাজ শেষ হয়েছে, এবার তা হলে চলে যাচ্ছ?

ফায়সাল বলল, সরকারের চাকরি করি, সরকারের হুকুম তো মানতেই হবে।

আমরাও তো তোমাকে চাকরি দিয়ে আনিয়েছি। সে ব্যাপারে কি করবে?

সরকারের আদেশ অনুসারে এখানে রিজাইন দিতে হবে।

আমরা যদি এ্যাকসেপ্ট না করি?

এ্যাকসেপ্ট না করার কোনো কারণ তো দেখছি না। বরং জিনের ও মানুষের দুশমণী থেকে আপনাদের দুশ্চিন্তা আল্লাহর ইচ্ছায় দূর করে দিয়েছি, সে জন্য খুশি মনে এ্যাকসেপ্ট করাই তো উচিত। তা ছাড়া আপনারা শিক্ষিত, সরকারের আদেশ আমার মানা উচিত, তা তো ভালো করেই জানেন।

আমরা শিক্ষিত হলেও তোমার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদের নেই। তাই তর্কে তোমার সঙ্গে পারব না। তাই এ ব্যাপারে আর কথা বলব না, তুমি যা ভালো বুঝবে করবে। এবার একটা কথা বলব, আশা করি, রাখবে।

বলুন, রাখার মতো হলে নিশ্চয় রাখব।

আমরা তোমার হাতে স্বপ্নাকে দিতে চায়।

ফায়সাল অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল, লুৎফা বেগম এ কথা বলবেন। তাই কি বলবে ভেবে রেখেছিল। বলল, বিয়ের ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোনো মতামত নেই। মা-বাবা যদি একটা কুৎসিত অন্ধ, কানা, খোঁড়া বা বোবা মেয়েকে বৌ করতে চান, তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই।

লুৎফা বেগম বুঝতে পারলেন, ম্যানেজার স্বপ্নাকে বিয়ে করতে রাজি নয়, মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে চুপ করে রইলেন।

ফায়জুন্নেসা ফায়সালের কথা শুনে মনঃক্ষুণ্ন হলেন। মাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফায়সালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি এত জ্ঞানী গুণী হয়ে মিথ্যে কথা বলবেন ভাবতেই পারছি না। আমরা জানি আপনার মা বাবা নেই, শুধু একজন ফুপু আছেন।

ফায়সাল মৃদু হেসে বলল, আল্লাহর কোনো মুমেন বান্দা মিথ্যা বলতে পারে না। যারা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে, তাদের আসল পরিচয় বাইরের লোকের কাছে গোপন রাখতে হয়। তাই চাকরির সময় যে বায়োডাটা দিয়েছি, সেটা আসল নয়।

লুৎফা বেগম মেয়েকে ধমকের স্বরে বললেন, আমি যখন কথা বলছি তখন তোমার চুপ করে থাকা উচিত। তারপর ফায়সালকে বললেন, যাওয়ার আগে ঠিকানা দিয়ে যেও, আমরা তোমার মা বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

মাফ করবেন, ঠিকানা দেয়া সম্ভব নয়। কারণটা তো একটু আগে বললাম। এবার লুৎফা বেগমও মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তা প্রকাশ না করে বললেন, কবে এখান থেকে যাবে?

এখনও সিদ্ধান্ত নিই নি, তবে দু'চার দিনের মধ্যে যেতেই হবে।

ঠিক আছে, এবার এস।

কুলসুম যখন খাওয়ার জন্য ডাকতে আসে তখন স্বপ্না দরজা লাগিয়ে চিন্তা করছিল, আজ মা নিশ্চয় নানিকে দিয়ে প্রস্তাব দেওয়াবে। তাই আধা ঘণ্টা পর বেরিয়ে এসে ড্রইংরুমের জানালার পর্দা অল্প একটু ফাঁক করে এতক্ষণ তাদের আলাপ শুনছিল। নানি এবার এস বলতে নিজের রুমে ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগল, ম্যানেজারের স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটা যদি আমি হই, তা হলে নানির প্রস্তাবে রাজি না হয়ে এড়িয়ে গেলেন কেন? মনে হয়, ওনাকে ধূর্ত, শঠ ও ঠক ধার্মিক ভাবতাম জেনে স্বপ্নের মেয়েটির মিথ্যে কাহিনী বানিয়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু ওনার মতো ছেলে তো মিথ্যা কাহিনী বানিয়ে বলতে পারেন না। তা ছাড়া ওনার চোখের দৃষ্টিতে যা দেখেছি, তাও মিথ্যা হতে পারে না। তখন তার মাস ছ'য়েক আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। একদিন ম্যানেজার তাকে দূরের এক জলমহল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে স্বপ্না বলল, আপনি তো বলেছিলেন, স্বপ্নের সেই মেয়েটি কিছুদিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে বাস্তবে অভিসার করবে, কই, আজ দেড় বছর হয়ে গেল একবারও অভিসার করল না?

ফায়সাল মৃদু হেসে বলেছিল, আপনি বুঝতে পারেন নি, সে তো প্রায় প্রতিদিন অভিসারে আসে এবং আজও আমার সঙ্গে অভিসারে বেরিয়েছে।

স্বপ্নাও মৃদু হেসে বলল, যদি তাই হয়, তা হলে তার সঙ্গে শুধু কাজের কথা আলাপ করেন কেন? অভিসারে বেরিয়ে তো প্রেমালাপ ও করে?

তা অবশ্য করে, কিন্তু মেয়েটিও করে না কেন বলতে পারেন?

স্বপ্নে লজ্জা পেত না, বাস্তবে পায় বলে। এবার একটা কথা বলব, রাখতে হবে।

বলুন, রাখার মতো হলে নিশ্চয় রাখব।

আমরা তুমিতে আসতে পারি না?

দুঃখিত, তা সম্ভব নয়।

কেন?

কর্মচারী হয়ে মালিককে তুমি বলা কি উচিত?

মালিক তো বলার অনুমতি দিচ্ছে? তা ছাড়া মালিক তো এখন প্রেমিকা?

তবুও সম্ভব নয়। কারণ এটা খুব অশোভনীয়। তা ছাড়া আমি ছোট বড়, এমন কি চাকর-চাকরানিদেরও আপনি করে বলি।

কারণটা বলবেন?

সবাইকে আমার থেকে বড় ও জ্ঞানী মনে করি।

আর যারা গরিব ও মূর্খ?

তাদেরকেও। কারণ একজন মানুষ শিক্ষিত বা ধনী হলেও গরিব বা মূর্খরা এমন অনেক জিনিস জানেন, যা অনেকেই জানেন না।

বিয়ের পরেও কি আমাকে আপনি করে বলবেন?

নিশ্চয় বলব।

কেউ নিজের স্ত্রীকে আপনি করে বলে?

কেউ না বললেও আমি বলব।

আমার লজ্জা করবে না বুঝি?

প্রথম প্রথম করবে, পরে করবে না।

তা হলে আমিও কিন্তু আপনি করে বলব।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু আপনি করে বললে দূরত্ব থেকে যায়।

ওটা মনের ভুল। আমার ধারণায় আপনি করে বললে ভক্তি, শ্রদ্ধা যেমন আরো বাড়ে, তেমনি প্রেমিক প্রেমিকার মর্যাদা স্থায়ী হয়। তুমি বা তুই করে বললে, একে অপরকে অপমান করা হয়, একজন অন্য জন্যের কাছে হেয়, মানে ছোট হয়ে যায়।

এরপরও ম্যানেজার নানির প্রস্তাব এড়িয়ে গেলেন কেন চিন্তা করতে করতে এক সময় স্বপ্না ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে কয়েকশ গ্রামবাসি চৌধুরী বাড়ির গেটে এসে শ্লোগান দিতে লাগল, "আমরা ম্যানেজারকে এখান থেকে যেতে দেব না।"

হট্টগোল শুনে স্বপ্না, ফায়জুন্নেসা ও লুৎফা বেগম বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দারোয়ানকে আসতে দেখে ফায়জুন্নেসা জিজ্ঞেস করলেন, এত লোকজন এসেছে কেন? তারা কি চায়?

দারোয়ান বলল, ওরা ম্যানেজার সাহেবকে এখান থেকে যেতে দিতে চাচ্ছে না।

ফায়জুন্নেসা বললেন, ম্যানেজারকে কথাটা জানাও।

দারোয়ানের মুখে ঘটনা শুনে ফায়সাল গেটের বাইরে এলে লোকজন বার বার ঐ একই শ্লোগন দিতে লাগল।

ফায়সাল তাদের চুপ করতে বলার পর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিরবতা নেমে এল।

ফায়সাল বলল, আমি কেন চলে যাচ্ছি, তা আপনারা গতকাল আই জি. সাহেবের কাছে শুনেছেন। তারপরও এরকম কেন করছেন বুঝতে পারছি না।

লোকজন চিৎকার করে বলল, কারও কথায় আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না। প্রয়োজনে এখানে আমরা আমরণ অনশন করে পড়ে থাকব।

ফায়সাল তাদেরকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো কাজ হল না। শেষে বলতে বাধ্য হল, আমি আই.জি. সাহেবকে আপনাদের কথা চিঠি দিয়ে জানাব। উত্তর না আসা পর্যন্ত যাব না। এবার আপনারা দয়া করে ফিরে যান।

গ্রামবাসির মধ্যে বসির অল্প শিক্ষিত হলেও খুব বুদ্ধিমান। সে বলল, আই. জি. সাহেবের চাকরি ছেড়ে দিন। আমরা সবাই সামর্থ অনুয়ায়ী কিছু কিছু জমি আপনাকে দেব, থাকার জন্য ঘর করে দেব, তবু আপনাকে যেতে দেব না।

ফায়সাল বলল, ঠিক আছে, আই.জি. সাহেব চিঠির উত্তরে কি জানান আগে দেখি, তারপর কি করব না করব জানাব। এবার আপনাদেরকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করছি।

ফায়সালের কথা শুনে আশস্ত হয়ে লোকজন চলে গেল।

ফায়সাল চলে যাবে তাই অফিসে এসে মৃণালবাবু ও স্বপ্নাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাল।

মৃণালবাবু এসে বললেন, ছোট মালেকিন তো আজ উপর থেকে নামেন নি।

ফায়সাল হাশেম মিয়াকে বললেন, ছোট মালেকিনকে আসতে বলুন।

হাশেম ফিরে এসে বলল, ওনার শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না।

ফায়সাল মৃণালবাবুকে বললেন, আপনাকেসহ ছোট মালেকিনকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে চাই, কিন্তু উনি আসতে পারছেন না। কাল সবকিছু বুঝিয়ে দেব।

পরপর তিন দিন একই কারণে স্বপ্না অফিসে এল না দেখে ফায়সাল চিন্তিত হল। ভাবল, কি হয়েছে জানা উচিত। তাই চাকরানি আকলিমা রাতের খাবার নিয়ে এলে জিজ্ঞেস করল, ছোট মালেকিনের কি হয়েছে?

আকলিমা বলল, কি হয়েছে জানি না, তবে আজ তিন দিন পানি ছাড়া কিছুই খান নি, রুম থেকে বারও হন নি, সব সময় মন ভার করে শুয়ে থাকেন।

ডাক্তার দেখান হয়েছে?

তা বলতে পারব না।

ফায়সালের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। আর কিছু না বলে খেতে শুরু করল।

খাওয়া শেষ হতে আকলিমা বাসন পেয়ালা নিয়ে যেতে উদ্যত হতে বলল, নানি আম্মাকে বলবেন, আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

একটু পরে আকলিমা ফিরে এসে বলল, আসুন। দোতলায় এসে আকলিমা তাকে ড্রইংরুমে বসতে বলে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর লুৎফা বেগমকে ঢুকতে দেখে ফায়সাল দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

লুৎফা বেগম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, বয়স হয়েছে ভাই, শরীরে নানা রকম উপদ্রব শুরু হয়েছে। তা কবে যাবে জানাতে এসেছ বুঝি? গ্রামের লোকজন সে কথা জানে?

কবে যাব এখনও ঠিক করি নি। আপনার নাতনির কি হয়েছে জানতে এসেছি। কি হয়েছে ওনার?

লুৎফা বেগম নাতনি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে জেনে তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পেরেছেন, ম্যানেজার তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় নি বলে তার এই অবস্থা। ফায়সালের কথা শুনে বললেন, কি হয়েছে আমরা জিজ্ঞেস করেও জানতে পারি নি। তুমি পার কি না দেখ। তারপর তাকে নিয়ে নাতনির রুমের দরজার কাছে এসে বললেন, একটু দাঁড়াও ঘুমিয়েছে না কি দেখি। তারপর পর্দা ঠেলে ঢুকে তাকে চোখের পানি ফেলে মোনাজাত করতে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্বপ্নার দৃঢ় ধারণা, ম্যানেজার তাকে ভীষণ ভালবাসলেও পূর্বপুরুষ জয়নুদ্দিনের কারণে বিয়ে করবেন না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চিরকুমারী থাকবে আর ম্যানেজার চলে যাওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করবে না। এই ক'দিন শুধু কেঁদেছে আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে, "আল্লাহ তুমি সর্বজ্ঞ। আমার অন্তরের কথা তুমি জান। আমি ওকে ছাড়া বাঁচব কি না তাও জান। ওর দ্বারা তুমি আমাকে হেদায়েত দিয়েছ। তোমার উপর ভরসা করে সবর করে আছি। তুমিই এর ফায়সালা করে দাও, দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে আমার মনের বাসনা পূরণ করে দাও। তোমার পেয়ারা হাবিবের উপর শত কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। ওনার অসিলায় তোমার এই নগন্য গোনাহগার বান্দির দো'য়া কবুল কর আমিন।"

আজ এশার নামায পড়ে দো'য়া শেষ করে যায়নামায গুটিয়ে রেখেছে, এমন সময় লুৎফা বেগম ম্যানেজারের আসার কথা বলে নাতনিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ত্রস্থপদে বেরিয়ে এসে ফায়সালকে বললেন, ও জেগে আছে তুমি যাও, আমি ড্রইংরুমে আছি। কথা শেষ করে দ্রুত চলে গেলেন।

নানির কথা শুনে স্বপ্না চমকে উঠল। সে ভাবতেই পারে নি ম্যানেজার তাকে দেখতে আসবেন। ভাবল, তা হলে কি আল্লাহ এই নাদান বান্দির দো'য়া কবুল করেছেন? নানিকে কিছু বলতে যাচ্ছিল; ওনাকে চলে যেতে দেখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

ফায়সাল ঢুকে সালাম দিতে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

এক সময় তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ফায়সাল তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এগিয়ে এসে বলল, সালামের উত্তর দিলেন না যে? গুনাহ হবে তো?

স্বপ্না সালামের উত্তর দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে উঠে বলল, কেন এসেছেন?

ফায়সাল বলল, স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটি আজ তিন দিন আমার সঙ্গে অভিসারে বের হয় নি, তাই আমিই এসেছি তার সঙ্গে অভিসার করতে।

কান্নাজড়িত স্বরে স্বপ্না বলল, আপনি এত নিষ্ঠুর? এরকম কৌতুক করে আমার জ্বলন্ত হৃদয়ে ঘি ঢালতে পারলেন?

আমি নিষ্ঠুরও নই আর কৌতুকও করি নি। যা সত্য, তাই বলেছি।

তা হলে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন কেন?

প্রত্যাখান তো করি নি, এড়িয়ে গেছি।

এড়িয়ে যাওয়া মানেই প্রত্যাখান করা।

না, আপনি ঠিক বলেন নি, দু'টোর মধ্যে পার্থক্য আছে।

পার্থক্য থাক বা না থাক, এড়িয়ে গেলেন কেন বলুন।

আমি যেমন আপনাকে মন প্রাণ উজাড় করে ভালবেসেছি এবং আল্লাহর কাছে সব সময় দো'য়া করি, তিনি যেন আমাদের জোড়া কবুল করেন। তেমন আপনিও আমাকে মন প্রাণ উজাড় করে ভালবেসেছেন এবং আল্লাহর কাছে ঐ একই দো'য়া করেন। তবু কেন আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হল বুঝতে পারছি না। আপনার মা ও নানির কাছে যা বলেছি, তা যেমন সত্য, এখন যা আপনাকে বললাম, তা তেমনি সত্য। আপনার কথা মা বাবাকে অনেক আগেই জানিয়েছি। আরও জানিয়েছি, খোকসাবাড়ির কাজ শেষ হওয়ার পর ওনাদেরকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাব। ওনারা এসে যেন আপনাকে পুত্রবধূ করার ব্যবস্থা করেন। গত পরশু মা বাবাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছি। আল্লাহ রাজি থাকলে কাল এসে যাবেন।

স্বপ্না নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, কয়েক সেকেন্ড স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আপনি মানুষ, না ফেরেশতা বলে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

ফায়সাল দ্রুত তার দু'টো হাত ধরে ফেলে বলল, একি করতে যাচ্ছিলেন? জানেন না, বিয়ের আগে এটা হারাম? তারপর হাত ছেড়ে দিল।

ততক্ষণে আনন্দে স্বপ্নার চোখ থেকে পানি পড়তে শুরু করেছে। ভিজে গলায় বলল, আমি সেই প্রথম থেকে ভুল বুঝে আপনার সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে আজ আবার হারাম কাজ করতে যাচ্ছিলাম। আমার সমস্ত আপরাধ ক্ষমা করে দিন বলে তার পায়ে হাত রাখল।

ফায়সাল তাকে দাঁড় করিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে তার চোখ মুখ মোছার সময় বলল, মানুষ মাত্রই জেনে না জেনে অনেক ছোট বড় অন্যায় করে ফেলে। সে জন্য প্রত্যেকের তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। আপনার সব রকমের অন্যায় আগে যেমন ক্ষমা করেছি, ভবিষ্যতেও তেমনি করব। এবার বলুন, এত বড়, সুখবর দেয়ার জন্য কি বখশীস দেবেন?

ফায়সাল স্বপ্নার রুমে ঢোকার পর লুৎফা বেগম মেয়ে ফায়জুন্নেসাকে ম্যানেজারের স্বপ্নাকে দেখতে আসার কথা বলে ডেকে নিয়ে এসে পর্দার আড়াল থেকে তাদের কথোপকথন শুনছিলেন। ফায়সাল বখশীস দেয়ার কথা বলতে লুৎফা বেগম রুমে ঢুকে বললেন, ওর তো নিজের কিছু নেই, যা ছিল সবটুকু অনেক আগেই তোমার মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে? বখশীস আমরা দেব বলে মেয়েকে ভিতরে আসতে বললেন।

ফায়জুন্নেসা ভিতরে আসার পর তাকে বললেন, তোর হবু জামাই স্বপ্নার কাছে বখশীস চাচ্ছে। ওর কি আছে দেবে? তুই কি দিবি দে।

বাইরে থেকে ম্যানেজারের কথা শুনে ফায়জুন্নেসা এত আনন্দিত হয়েছেন যে, তখন থেকে চোখের পানি ফেলছিলেন। মা ডাকতে চোখ মুছে রুমে এসেছেন। এখন বখশীস দেয়ার কথা শুনে আবার চোখ থেকে পানি বেরিয়ে পড়ল। সেই অবস্থায় বললেন, আমাদের যা কিছু আছে সব পূর্বপরুষদের অবৈধ টাকায়। তোমার মতো পবিত্র ছেলেকে ঐ অবৈধ থেকে কিছু দেয়া ঠিক হবে না। তাই শুধু আল্লাহর কাছে দো'য়া করছি, "তিনি যেন তোমাদের দাম্পত্যজীবন সুখের ও শান্তির করেন এবং পরকালের জীবনে বেহেশত নসীব করেন।" তারপর বললেন, আমি আল্লাহর এক নিকৃষ্ট বান্দি। জানি না, আল্লাহ আমার দো'য়া কবুল করবেন কি না। তারপর সেখান থেকে চোখ মুছতে মুছতে চলে যেতে উদ্যত হলে ফায়সাল বলল, দাঁড়ান মা, যাবেন না।

ফায়সালের মা ডাক শুনে ফায়জুন্নেসা চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার মতো ছেলের মা হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।

ফায়সাল বলল, মায়ের যোগ্যতার বিচার করার অধিকার কোনো সন্তানের নেই। তারপর এগিয়ে এসে কদমবুসি করে বলল, সন্তানের কাছে মায়ের দো'য়া হল, শ্রেষ্ঠ উপহার, সমস্ত পৃথিবীর রাজত্বের চেয়ে মূল্যবান এবং ইহকাল ও পরকালের সুখ শান্তি। তারপর লুৎফা বেগমকে কদমবুসি করে বলল, ঠিক বলি নি নানি মা?

লুৎফা বেগমও আনন্দে এতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারলেও এখন আর পারলেন না, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার মতো আল্লাহর প্রিয় বান্দা কখনও বেঠিক কিছু বলতে পারে না।

ফায়সাল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফায়জুন্নেসা বললেন, কিন্তু আমি আল্লাহর একজন নিকৃষ্ট বান্দি, আমার দো'য়া কি আল্লাহ কবুল করবেন?

ফায়সাল বলল, যাই কিছু হন না কেন, আপনি মা। আর সন্তানের জন্য মায়ের দো'য়া কবুল হবেই। আপনি জানেন কি না জানি না, বান্দা যত বড় গুনাহ করুক না কেন, অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানি ফেলে তওবা করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। কারণ অনুতপ্ত বান্দার চোখের পানি আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়।

লুৎফা বেগম বললেন, হ্যাঁ ভাই, তুমি ঠিক বলেছ, এটা হাদিসের কথা। কথা শেষ করে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

ফায়জুন্নেসাও চোখ মুছতে মুছতে মাকে অনুস্মরণ করলেন।

এবার আমার পালা বলে ফায়সাল স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে তার চোখ থেকে পানি পড়ছে দেখে বলল, নানিমা ও মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন, আপনিও কাঁদছেন, আমি আর বাকি থাকি কেন বলে কান্নার অভিনয় করল।

স্বপ্না কান্নামুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, থাক, আর অভিনয় করতে হবে না, দু'বছর অভিনয় করে সবাইকে অনেক কাঁদিয়েছেন।

ফায়সাল বলল, তাই তো শেষ অভিনয় করে আপনাকে হাসালাম।

স্বপ্না চোখ মুখ মুছতে মুছতে বলল, সত্যি, একজন মানুষের মধ্যে যে এত গুণ থাকতে পারে, আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

ফায়সাল বলল, স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটি, যে নাকি অপূর্ব সুন্দরী ও ফরেন থেকে উচ্চডিগ্রিধারী হয়েও আমার মতো একজন সাধারণ ছেলের প্রেমে পড়বে ভাবতেই পারি নি।

এই কথাই দু'জনেই হেসে উঠল।

***